ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

২২ জুন ১৯৭৯



জেভিয়ার পায়াস
শ্যাম থাপা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



যূথিকা পাল / পাহাড়ী রায়চৌধুরী

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ৮ ॥ ২২ জুন ১৯৭৯

কলকাতার ফুটবল লিগে এখন ঠিক ভরা জোয়ারের আগের মুহূর্ত। অর্থাৎ আর কদিন পরেই সেই চির পুরাতন 'মর্যাদার' লড়াই-এর ফল ঠিক করে দেবে এবারে লিগ কারা পাচ্ছে। কিন্তু কলকাতার লিগ ও শিল্ডের খেলা ছাড়াও ফুটবল নিয়ে আরও অনুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে যারা মাথা ঘামান, তারা কিন্তু নানারকম অস্বস্তিতে ভুগছেন বললে সত্যের অপলাপ হবে না। তিনটি প্রধান দলের মধ্যে এবার অন্য রাজ্য থেকে কমপক্ষে দশজন লিগে খেলছেন। এছাড়া অন্য রাজ্য থেকে আসা অনেক বছর ধরে কলকাতায় খেলছেন তাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রত্যাশা ছিল খাস বাংলার ছেলেরা ছাড়া অন্য রাজ্যের ফুটবল খেলোয়াড়রা কলকাতার ফুটবলকে সমৃদ্ধ করবেন। কিন্তু মরশুমের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনটি দল সমানে জিতে চলেছে কিন্তু কিছু বাতিকগ্রস্ত উগ্র সমর্থক ছাড়া আর কেউ খেলা দেখে খুশী হচ্ছেন না। ক্লাবের কর্মকর্তারা নানারকম যুক্তি দিচ্ছেন, 'হবে হবে, ভাল খেলা দেখবেন।' কোচেরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। আই এফ এ-র কর্মকর্তারা বলছেন, 'আরও তিন বছর অপেক্ষা করুন। তারপর দেখবেন কলকাতার ফুটবলকে আমরা কোথায় পৌঁছে দিয়েছি।' সরকার মাথা ঘামাচ্ছেন যাতে ময়দানের উগ্র সমর্থকরা বড় রকমের অশান্তি ঘটাতে না পারেন। উগ্র সমর্থকদের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য ঢালাও জলের ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু কলকাতার ফুটবল দেখতে গিয়ে আনন্দ লাভ করার চেয়ে সকলে রেগে যাচ্ছেন। রাগ পুষে রাখছেন কোন অঘটনের অপেক্ষায়। যদিও তারা জানেন বাকি দলেরা সব ময়দানের 'বলির পাঁঠা'। আত্মদানেই তাদের চরম তৃপ্তি ; বড় দলের বিপক্ষে কোন অঘটন যেন না হয়। কাজেই কলকাতার ফুটবল চলছে, চলবে।



সম্পাদক অতুল মুখার্জি
শিল্প নির্দেশক নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০
বিমান মাশুল
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

যা আছে

ফুটবল :
বিলি সুসির 'জয় ফুটবল জয়'
কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/স্বরাজ ঘোষ/২৯
তিন প্রধান জিতছে, পয়েন্ট পাচ্ছে/২
লিগের অন্য খেলা, গড়াপেটা শুরু/৪৫
পাদপ্রদীপের আলোয় : প্রদীপ ব্যানার্জি/ হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/১০
ময়দানে চিকিৎসার সুযোগ কতটুকু/সুভাষ দত্ত/১৬

বিশেষ রচনা :
বিবর্ণ বর্গ কি আবার উইম্বলডন জিতবেন /সুব্রত সরকার/১৩
ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুত শিল্পে বাংলা পিছিয়ে কেন/অশোককুমার দাশগুপ্ত/২৬
ইংল্যাণ্ডে ভারতের জয় যত হার তার আঠারো গুণ/বিপ্লব রায়/৪০
সরকার একটু এগোলেই কলকাতায় সাঁতারুদের কল্লোল বয়ে যেতে পারে/১৪
ছোটদের পাতা—'উঠছে যারা'/৪৪

অন্যান্য :
সুখী গৃহকোণে বিশ্বনাথ (ছবিতে)/২৪
ও টি নার্স, দুই সন্তানের মা—নেশা রাইফেল স্যুটিং/অশোক চট্টোপাধ্যায়/১৯
বাংলাদেশে ফিলিপস টেনিস/আব্দুল তৌহিদ/২২
বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়/অমল ত্রিবেদী/২৩
আন্তঃজেলা খো-খোয় ২৪ পরগণার দ্বিমুকুট/৩১
ইয়টিং-এ ভারতের উন্নতির জন্য উদ্যোগ /নারায়ণ ঠক্কর/৩২
গ্রামীণ খেলাধূলায় মালদা এগোচ্ছে/বিপ্লব তালুকদার/৩৫
পূর্বাঞ্চল ভলিবল দর্শক টানতে পারেনি/৩৬
বাস্কেটবলে সবার সেরা হনুমান সিং/মিলন দত্ত/৩৮
আর্থিক কারণে তবু অকালে ময়দান ছেড়েছিলেন /সমীর সেনগুপ্ত/৩৯

ছড়া/মজা :
মাঠের ছড়া/ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়/২৩
বিদেশ গেল ওরা/তাপসকুমার পাল/৩০
বলো দেখি/চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়/৪২
দ্বিজুদার আশেপাশে/দিগদর্শক/৩৪

এছাড়া : ওলিম্পিকের গপ্পো/৯, কিস্তিমাত/হিমানীশ গোস্বামী /১৮, পাঠকের কলমে/২০, যদৃচ্ছং/ব্যাসদেব/৩০, ডাকটিকিটে খেলাধূলা/তপন রায়/৩৩, সুপ্ত বজ্রাসন/মনতোষ চৌধুরী/৩৭।
কার্টুন : এঁকেছেন রাজা ও হিম।

প্রচ্ছদের ছবি : তপন রায়। **অন্যান্য ছবি :** পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস, তপন রায় ও অন্যান্য।



মোহনবাগান : পোর্ট ট্রাস্ট। মানস প্রথম গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিল /সাত্যকী

তিন প্রধান জিতছে পয়েন্ট পাচ্ছে

মোহনবাগান—২ ঃ পোর্ট ট্রাস্ট—০
(মানস, তপন)

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ৭ জুন ঃ-

পোর্ট দলকে মোহনবাগানের ডাকসাইটে খেলোয়াড়রা ল্যাজে গোবরে করে ছাড়বে এটাই আশা ছিল। বিশেষ করে এর আগের ম্যাচে বি এন আর-কে ৫—০ হারাবার পর সমর্থকদের এই শুভ বাসনা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাসের রূপ নেয় সমর্থিত দল ২—০ গোলে জয় পেলে। ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতা ঢাকতে গৌতম এদিন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের নির্দিষ্ট জায়গার সঙ্গে বিপক্ষ সীমানার অনেকখানি জমিতে অবলীলাক্রমে খবরদারি করেছে গৌতম। গোলদুটিও হয় তার নিখুঁত পাস থেকেই। খেলেছে প্রসূনও।

ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাশায়ী বিদেশের ঘাটতি ভরাট করতে শ্যাম মাঠে নামে তপনকে লেফট আউটে নিয়ে। কিন্তু মাত্র ৩৫ মিনিটে মালুম পেয়েছে মানস, পায়াস, তপন বা বিদেশের মত তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করা এখন আর তার ধাতে পোষাবে না। তিন মিনিটের মাথায় শ্যাম তার লক্ষ্যভেদ করার সেরা অস্ত্র বাই-সাইকেল কিক করার চেষ্টা করেছিল তবে বলের লাইনে পা যায়নি। তপন সারাক্ষণ ছোটাছুটি করেছে কারণে অকারণে। বলও পেয়েছে প্রচুর কিন্তু বেশীরভাগ বিপক্ষের ডিফেণ্ডারদের দৃঢ় প্রত্যয়ের বাঁধুনির ফাঁস আলগা করতে না পেরে তাদের পায়ে বল জমা দিয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করার ত্রুটি কিছুটা লাঘব করেছে শেষ হওয়ার মিনিট তিনেক আগে একটি গোল করে। অপর ফরোয়ার্ড পায়াস প্রথম হাফে পায়ে বল ধরে রাখার ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা করে বিফল হয় এবং প্রথম হাফে অন্তত গোটা চারেক বল বাইরে পাঠায়। দ্বিতীয় দফায় স্বভাবসিদ্ধ ওয়ান টাচ ফুটবলে ফিরে গিয়ে গোল করার মত গোটা তিনেক বল দিয়ে ছিল শ্যামের বদলী উলাগাকে। কিন্তু গোলমুখে নিজের কারিকুরি দেখানোর প্রবণতার খেসারত দিতে উলাগা একবার ডান দিকের পোস্টে বল মারে এবং বাকি সময় পোর্ট স্টপার অভিজ্ঞ সলিল দাস খুব সহজেই বল কেড়ে নেয় উলাগার পা থেকে। তবে উলাগা এদিন কয়েকবার সু— ভাবে বল দিয়েছিল যা সতীর্থরা কাজে লাগাতে পারেনি। একটি গোল করা ছাড়া মানস এদিন কোন সময়েই খুব ভাল খেলেনি। কখন সখন জ্বলে উঠে সতীর্থদের বল বাড়িয়েছে কিন্তু কোনটাই কাজে লাগেনি।

ডিফেন্সে প্রদীপ চৌধুরী ছিল একাই একশো। বিপক্ষের আক্রমণ বিকল করার সঙ্গে সঙ্গে হাফ ও ফরোয়ার্ডদের বল জুগিয়েছে অক্লান্তভাবে। তবে গোল করার তাগিদে নিজের জায়গা ছেড়ে বল নিয়ে বিপক্ষ গোলমুখে চলে যাওয়া সতীর্থ সুব্রতর অনুপস্থিতিতে দু'দিক এক সঙ্গে সামাল দিতে প্রদীপের প্রাণান্ত হয়েছে। সুব্রত এদিন অনাবশ্যক ঝুঁকি নিয়ে অনেকবার দলের বিপদ ডেকে এনেছিল। প্রথম হাফের ২০ মিনিটে পোর্ট স্ট্রাইকার প্রদীপ ভট্টাচার্যের সহ খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করে বাড়ানো বল ঠিক সময় না ধরে সমর্থকদের বাহবা কুড়তে গেলে বিপক্ষ উইঙ্গার শংকর দাস তড়িঘড়ি ছুটে এসে বল কেড়ে নেয়। মোহনবাগান গোলরক্ষক প্রতাপ সময় মত গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে কোন রকমে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শংকরের পা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল ছিনিয়ে নেয়। দুই সাইডে দিলীপ, কম্পটন মোটামুটি খেলেছে।

ঝড়ের বেগে প্রথম ধাক্কাতেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে মোহনবাগানের আক্রমণভাগের ব্যস্ততাকে পোর্টের দুই স্টপার সলিল ও গৌতম ২১ মিনিট পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল। মাঝ মাঠ বরাবর বিপক্ষ সীমানায় ঢুকে পড়ে গৌতম বল বাড়ালে তাতে প্রসূন গোলে সট নেয়। কিন্তু গোলরক্ষক দীপক বড়ুয়া ডাইভ দিয়ে আংশিকভাবে প্রতিহত করে। ফিরতি বলে শ্যাম মাটিতে পড়ে থাকা দীপকের গায়ে মারে। গায়ে লেগে বল মানসের পায়ে যায়। ফাঁকা গোলে বল পাঠাতে মানসের কোন অসুবিধা হয়নি। দ্বিতীয় গোল তপনের। ডানদিক থেকে গৌতমের সেণ্টার বাগে এনে তপন ঠেলে দেয় উলাগাকে এবং উলাগার ফিরতি পাসে জনা তিনেক বিপক্ষ ডিফেণ্ডারের ফাঁক দিয়ে তপনের আলতো সট বাঁদিকের পোস্টে লেগে জালে জড়িয়ে যায়।

প্রথমদিকে পোর্ট কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রথম গোলটি খাবার পর আক্রমণ শানাবার চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে সবাই ঘর সামলাবার কাজে ব্যস্ত হয়। খেলা শুরুর আট মিনিটে কাশী পাল রেফারির সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়ে হলুদ কার্ড দেখে। এদিন সদ্যপ্রয়াত মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের — আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর খেলা শুরু হয়।

মোহনবাগান—প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও দিলীপ পালিত, গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা (উলাগানাথন), জেভিয়ার পায়াস ও তপন দাস।

পোর্টট্রাস্ট—দীপক বড়ুয়া, অলোক সাহা, সলিল দাস, গৌতম দত্ত ও নন্দ শীল, অলোক দাস ও মানিক বসু, কাশী নন্দী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রবীর মজুমদার ও শঙ্কর দাস।

রেফারি—তারক সেন।

মহমেডান স্পোর্টিং-১ ঃ কালিঘাট-০
(নাজিব)

৮ জুন ঃ কালিঘাটের বিপক্ষে মহমেডান প্রথম ৩৫ মিনিট রীতিমত উজ্জীবিত চেহারা নিয়ে মাঠে বিচরণ করেছে। এই সময় মনে হয়েছিল, মহমেডান আজ মরশুমের সর্বোচ্চসংখ্যক গোল করবে। করতে পারতও। প্রথমার্ধে একটি গোল করা ছাড়া অন্তত আরও চার পাঁচটি গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে বা কালিঘাট গোলরক্ষক বাঁচিয়েছে।

প্রথমার্ধের ষোল মিনিট নাগাদ মহমেডান দিনের একমাত্র গোলটি পেয়েছে। গোলকিপার নাসির আমেদের লম্বা সট কালিঘাট বক্সে ড্রপ খাওয়ায় খাবাজি হেড করে নাজিবের কাছে পাঠায়। দুজন বিপক্ষ ডিফেণ্ডারকে ত্বরিত পিছনে ফেলে নাজিবের পা থেকে যে চমৎকার ভলি সটটি ছিটকে বেরোয়, সেটা আটকাবার ক্ষমতা প্রশান্তর ছিল না।

গোলের আগে এবং পরে মহমেডান ক্রমান্বয় কালিঘাট রক্ষণে আঘাত হানতে থাকে। সমরেশ গ্রহণ করে উদ্দীপ্ত ভূমিকা। বক্সের বাইরে থেকে তার একটি সহজাত দুর্দান্ত সট বারের উপর দিয়ে চলে যায়। লতিফুদ্দিনেরও একটি চমৎকার সোয়ার্ভ করা সট বেরিয়ে যায় দ্বিতীয় পোস্ট ঘেঁষে। নাজিব এবং লতিফুদ্দিনই তাদের প্রচেষ্টা দ্বারা আক্রমণকে জীবন্ত করেছিল।

সেকেণ্ড হাফে মহমেডানের ভূমিকা অনেক ম্লান হয়ে পড়ে। দুটো অর্ধে একটি টিমের খেলায় এতটা তারতম্য হবে, ভাবা যায়নি। এই হাফে ওদের খেলা হয়েছে উদ্দেশ্যহীন, খাপছাড়া।

কালিঘাট এবারের মরশুমে দারুণ খেলছে। এদিন প্রথমার্ধের প্রায় পুরো সময়টা ওরা গুটিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে যথেষ্ট আক্রমণ হেনেছে বড় দলের রক্ষণে। এবং বারংবার বিব্রত করেছে। লেফট উইঙ্গার বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়েছে। দুই লিঙ্কম্যান সুজিত দাস ও সনাতন চৌধুরী বেশ পরিশ্রম করেছে, খেটেছে রক্ষণেও।

প্রেমনাথ ফিলিপ আজই প্রথম মাঠে নামে। তার উপস্থিতি মহমেডান রক্ষণকে স্বস্তি দেবে। রহমান আজ, সম্ভবত দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে এসেছিলেন। তাকে মাঝে মাঝেই দেখেছি, সাইড লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের পরামর্শ ছুঁড়তে। শুনলাম, আকবর কলকাতায় এসেছে এবং কিছুদিনের মধ্যে মাঠে নামবে। এদিনের ম্যাচ নিয়ে কালিঘাট ৯টি ম্যাচের জিতেছে পাঁচটিতে, হেরেছে তিনটিতে এবং ড্র করেছে একটিতে।

মহমেডান স্পোর্টিং :—নাসির আমেদ, প্রেমনাথ ফিলিপ (হাবিব খান), অশোক চক্রবর্তী, মহীদুল ইসলাম, মুস্তাফা, সমরেশ চৌধুরী, হাবিব, লতিফুদ্দিন, নাজিব, সাজ্জারি, খাবাজী (দীনকর)।

কালিঘাট :—প্রশান্ত নন্দী, ইন্দ্রবীর সেন, বাসু চৌধুরী, কাঁকন সেন, রঞ্জিত চ্যাটার্জি, সুজিত দাস, সনাতন চৌধুরী, স্বপন মিত্র, সুমন্ত দাম, সুভাষ মোদক, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।



কালিঘাট গোলমুখে সাজ্জারি বলের নাগাল পেতে চাইছে, কালিঘাটের প্রশান্ত ও ইন্দ্রবীর চাইছে তাকে ব্যর্থ করতে/অরুণ মুখার্জি

ইস্টবেঙ্গল-১ : রাজস্থান-০ (সাবির)

৯ জুন : ইস্টবেঙ্গল পঞ্চম ম্যাচের মত ষষ্ঠ খেলাতেও রাজস্থানের বিপক্ষে এক গোলে জয় পেয়েছে। তবে গত দিনের মত বিবর্ণ ভূমিকায় ইস্টবেঙ্গল এদিন মাঠে বিচরণ করেনি। খেলেছে দাপট বিছিয়ে, প্রাধান্য বিস্তার করে। খেলা আরম্ভের কিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল গোল পেয়েছে এবং বাকি সময়ে মিস করেছে গোলের সুযোগ। আসলে, কলকাতা ফুটবলে সুযোগের অপচয় দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

ইস্টবেঙ্গল গোলটি পায় মিনিট চারেকের মাথায়। ডেভিডকে বলটা দিয়েই সাবির বক্সের দিকে ছুটে যায়। ডেভিড বাম প্রান্ত ধরে চমৎকারভাবে এগিয়ে প্রায় লাইনের উপর থেকে মাইনাস করে। সাজ্জাদ বুদ্ধি করে বলটা না ধরে রাজস্থান ডিফেণ্ডারকে ভাঁওতা দেয়। বাকি কাজটুকু চুকিয়ে দিতে ওৎ পেতে থাকা সাবিরের কোন অসুবিধা হয় না।

এরপর আমরা দেখি গোলের চান্স নষ্ট হতে। তারই মাঝে প্রথমার্ধের ২৮ মিনিটে প্রশান্তর ৩৫ গজ দূর থেকে নেওয়া একটি চমকানো সট ক্রশ বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। গত ম্যাচেও প্রশান্ত এধরনের দু-তিনটি দারুণ সট করেছিল। এগুলো যেকোন সময়ে কার্যকরী হয়।

সাবির আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেলেছে। এ মরশুমে সে সত্যিই ভালো খেলছে। তবে দুই উইঙ্গার এদিন কিছুটা ম্লান ছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য সুরজিৎ ঝলসে উঠেছে। একবার সে একক প্রয়াসে রাজস্থান ডিফেন্স ভেঙে একটি দেখবার মত মাইনাস বাড়িয়েছিল। কিন্তু রাজস্থান গোলকিপার শেখ আখতার চমৎকার দক্ষতায় সেটি ধরে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের কিছু সময় বাদে লেফট উইঙ্গার সাজ্জাদের বদলে সুভাষ মাঠে আসে। তবে তেমন সুবিধে করতে পারেনি। দেবরাজ আজ ভালো খেলেছে। মনোরঞ্জনের কথা বলাই বাহুল্য।

রাজস্থান রক্ষণ প্রথমে কিছুটা এলোমেলো খেললেও পরের দিকে দৃঢ়তা দেখিয়েছে। দল নায়ক বিজয় দিকপতিকে কেন্দ্র করে ডিফেন্স আঁটোসাটো হয়েছে। হাফে অবনী আইচ চোখে পড়েছে। আক্রমণভাগে সবচেয়ে বেশী নজর কেড়েছে প্রীতি ঘোষাল। বাম প্রান্ত



রাজস্থানের গোলরক্ষক শেখ আখতার ডেভিড উইলিয়ামসের পা থেকে বল তুলে আঁকড়ে ধরেছে বুকে/অরুণ মুখার্জি

দিয়ে বারকয়েক সে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে নড়িয়েছে। হীরালাল মুখার্জি, কার্তিক শেঠরাও মাঝে মধ্যে বল নিয়ে উঠেছে। কিন্তু গোল হবার মত পরিস্থিতি ওরা সৃষ্টি করতে পারে নি। 'আজকের ম্যাচ নিয়ে রাজস্থান খেলেছে ৯টি, জিতেছে পাঁচটিতে, হেরেছে বাকি চারটি ম্যাচে।'

ইস্টবেঙ্গল : ভাস্কর, চিন্ময়, মনোরঞ্জন, গুরদেব, সত্যজিৎ, প্রশান্ত, দেবরাজ, সুরজিৎ, ডেভিড, সাবির, সাজ্জাদ (সুভাষ)।

রাজস্থান : শেখ আখতার, এস পাল চৌধুরী, সুশান্ত ঘোষ, বিজয় দিকপতি, প্রভাস ঘোষ, অবনী আইচ, গৌতম সাহা (স্বপন পলসাই), বিভু রায় (প্রণব ভৌমিক), হীরালাল মুখার্জি, কার্তিক শেঠ, প্রীতি ঘোষাল।

রেফারি : দিলীপ সেন।

মহমেডান স্পোর্টিং-২
(লতিফুদ্দিন)
হাওড়া ইউনিয়ন-০

১১ জুন : মহমেডান নিজের মাঠে লিগে ষষ্ঠ ম্যাচে হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে জয় তুলল দু গোলে, পর্যাপ্ত প্রাধান্য ছড়িয়ে। মহমেডান এদিন উন্নত ফুটবল খেলেছে। আক্রমণ করেছে দ্রুত ও ঘন ঘন এবং তার অনেকগুলোই ছিল যোগাযোগ পূর্ণ। কিন্তু যথারীতি গোলের সুযোগের অপচয় ঘটাতেও পিছপা ছিল না তারা। আর তার ফলেই মহমেডান প্রথমার্ধে কোন গোল পায়নি।

অথচ খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটেই সেটা পেল। মুস্তাফার একটি সুন্দর সেন্টার লতিফুদ্দিন বুকে করে নামিয়েও আয়ত্তে রাখতে পারেনি। কিছুক্ষণ পর নাজিবের একটি সট হাওড়া গোলকিপার পীযূষ মণ্ডল বাঁচাবার পর ফিরতি বলে হাবিবের সট বারের উপর দিয়ে চলে যায়। একটু পরেই মহমেডানের সামনে গোল পাওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে। কিন্তু নাজিব এবং সানজারির অযথা দেরিতে চান্সটি হাতছাড়া হয়। দুজনেই সট নিতে ব্যর্থ হয়। অথচ ওটা করতে পারলেই গোল ছিল। নাজিব বলের উপর বসে পড়ে। প্রথমার্ধে হাওড়া একবারই মাত্র গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। রাইট আউট প্রদীপ মিত্র'র একটি চমৎকার সেন্টার কানন পা ছোঁওয়াবার আগেই নাসির আমেদ ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেয়।

মহমেডান সেকেণ্ড হাফের প্রথম দিকেই গোল করার জন্য বদ্ধপরিকর মন নিয়ে মাঠে নামে। এবং সাত মিনিটে গোল পায়। সমরেশ মাঝ মাঠ থেকে বল লব করে। সানজারি বামপ্রান্ত থেকে বলটা বক্সে পাঠায়। তখন সেখানে জটলা। খাবাজি তার মধ্যেই বল ঠেলে নাজিবকে। নাজিব সট নেয়। গড়ানো বল একজন বিপক্ষ ডিফেণ্ডারের পায়ে লেগে, লতিফুদ্দিনের কাছে আসে। কালবিলম্ব না করে সে জালে বল পাঠায়।

লতিফুদ্দিনই ছিল এদিন মহমেডান আক্রমণের উৎস। অনেকবার ডানদিক থেকে ভিতরে ঢুকে সে গোলের সামনে বল তুলেছে। নাজিব পরিশ্রম করে গেছে সারাক্ষণ। এবং সমরেশ সহায়তা করেছে আক্রমণভাগকে। তার কয়েকটি জমি ঘেঁষা পাস ও লব বিপক্ষের ডিফেন্স চিড়েছে। ফ্রি-কিক থেকেও সে দুবার সুন্দরভাবে বল তুলেছিল বক্সে। সমরেশ ধীরে ধীরে তার স্বভাবসিদ্ধ খেলা ফিরে পাচ্ছে। হাবিবের খাটুনিতে কোন ভেজাল নেই। তবে ততটা সুবিধে করতে পারে[illegible] ফরোয়ার্ড লাইনে খাবাজিকে বেমানান ঠেকছে। গোলকিপারকে একা পেয়েও সে সুযোগ হারায়।

মহমেডান দ্বিতীয় গোল পায় দ্বিতীয়ার্ধের বাইশ মিনিটে। মুস্তাফা বামদিক থেকে উঠে এসে নাজিবের দিকে বল তোলে। নাজিব হেড করে বলটা নামিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে লতিফুদ্দিনের চকিত সট অভ্রান্ত লক্ষ্যে গোলে ঢুকে যায়।

এবারের লিগে হাওড়া ইউনিয়নের অবস্থা বেশ খারাপ। অথচ কানন, শিশির গুহ দস্তিদার, শ্যামসুন্দর মান্না, সুব্রত চ্যাটার্জিরা



মহমেডানের সানজারিকে রুখে দেবার এছাড়া আর বুঝি কোন উপায় ছিল না হাওড়া ইউনিয়নের গোলকিপারের/পাহাড়ী

দলকে সমৃদ্ধ করেছে। কাঙ্কন তো কয়েক বছর ধরেই হাওড়ার আক্রমণভাগে রয়েছে। এদিন শিশির, কাঙ্কন, শ্যামসুন্দর'রা চেষ্টা অবশ্য করেছে। তবে তেমনভাবে ফুঁসে উঠতে পারেনি। খেলা ভাঙার কয়েক সেকেণ্ড আগে কাঙ্কনের একটি চমৎকার সট নাসির বারের উপর দিয়ে তুলে দেয়। হাওড়া ইউনিয়নের অবশ্য এদিন মূল লক্ষ্য ছিল বিপক্ষকে গোল করতে না দেওয়া। সে কাজে ৪২ মিনিট পর্যন্ত ওরা সফল হয়। হাওড়ার দুই স্টপার, বিশেষ করে নির্মল রায় চৌধুরী অনেক আক্রমণ রুখেছে। শেষ সময়ে খাবাজির হেড করা বল লাইন থেকে সে ফিরিয়ে দেয়। এছাড়া লড়েছে প্রসন্ন ঘোষও। এবং পীযূষ গোল পাহারা দিয়েছে দৃঢ়তার সঙ্গে।

মহমেডানের রাইট ব্যাকে ফিলিপের জায়গায় এদিন খেলেছে কিশোরী মণ্ডল। এবং সে আস্থা সহকারে খেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে সানজারির জায়গায় অমলরাজ আসায় হাবিব আক্রমণভাগে উঠে আসে। হাওড়াও মাঝপথে একটি পরিবর্তন ঘটায়। লেফট ব্যাক মৃদুল মুৎসুদ্দির স্থান নেয় নরেন দত্ত। এদিনের খেলা ধরে হাওড়ার ৯টি ম্যাচে হল তিন পয়েন্ট।

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ নাসির আমেদ, কিশোরী মণ্ডল, মহিদুল ইসলাম, অশোক চক্রবর্তী, মুস্তাফা, সমরেশ চৌধুরী, হাবিব, লতিফুদ্দিন, নাজিব, সানজারি (অমলরাজ) ও খাবাজি।

হাওড়া ইউনিয়ন ঃ পীযূষ মণ্ডল, কানু মজুমদার, শঙ্কর মৈত্র, নির্মল রায়চৌধুরী, মৃদুল মুৎসুদ্দি (নরেন দত্ত), শ্যামসুন্দর মান্না, প্রসন্ন ঘোষ, প্রদীপ মিত্র, সুব্রত চ্যাটার্জি, কাঙ্কন ও শিশির গুহ দস্তিদার।

রেফারি ঃ সুশান্ত চৌধুরী।

ইস্টবেঙ্গল-৩ (সাবির আলি—৩ হ্যাটট্রিক) রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-১ (কিশোর মুখার্জি)

১২ মে, মঙ্গলবার ঃ তখন দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিট। দেবরাজের লব সুরজিত ধরল একেবারে ফাঁকা অবস্থায়। সামনে শুধু গোলকিপার। নিজের গোল করার একশ ভাগ নিশ্চয়তা থাকা সত্বেও সুরজিত তা করল না। ঠেলে দিল বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাবিরকে নিখুঁতভাবে। মুহূর্তের মধ্যে সাবিরের লেফট ফুট সট জড়িয়ে গেল জালে। সাবির হ্যাটট্রিক করল—৭৯-র লিগ মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক। এবং এটা সম্পন্ন হল লিগ শুরুর একমাস চারদিন পর। গতবারের লিগে প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিল মীর সাজ্জাদ, মহমেডানের হয়ে বাটার বিপক্ষে। এবং সেটা ঘটেছিল লিগ শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই। হ্যাটট্রিক করার পর সাবির কৃতজ্ঞ চিত্তে ছুটে এল সুরজিতের দিকে। সারা মাঠ আনন্দে বিভোর। কিন্তু অল্পক্ষণ আগে দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে মাঠে নীরবতা নেমে এসেছিল, যখন রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের এদিনের আক্রমণভাগের সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলোয়াড় কিশোর মুখার্জির বক্সের মাথা থেকে নেওয়া তৎপর সটটি ডাইভ দেওয়া ভাস্করের আঙুলে লেগে ইস্টবেঙ্গল জালে জড়িয়ে যায়। খেলার ফল ২-০ থেকে ২-১ হয়। গোলটির ক্ষেত্রে ভাস্করের বেশ দায়িত্ব ছিল। ওর ডাইভটি সময়মত ও নিখুঁত হয়নি। ওর শরীরটা যেখানে ফেলে, বলের থেকে তার সামান্যতম দূরত্ব ছিল। কিশোর মুখার্জি প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটেও এ ধরনের একটি চকিত সট নিয়েছিল লিঙ্কম্যান সুবিমল ঘোষের কাছ থেকে বল পেয়ে। ভিজে মাটিতে দেহের ভারসাম্য হারালেও ভাস্কর দক্ষতার সঙ্গে সেটা ধরে ফেলে।

ফল ২-১ হওয়ায় ঝপ করে গ্যালারিতে শুদ্ধতা নামে। অতঃপর ফুঁসে উঠে ইস্টবেঙ্গল ৩-১ করে। এবং এই ফলেই ম্যাচ জেতে। ইস্টবেঙ্গল এদিন গৌরব এবং অগৌরব—দুটোই পেল। গৌরব হল সাবিরের হ্যাটট্রিক করা। আর অগৌরব—বিপক্ষে একটি গোল হয়ে যাওয়া। ইস্টবেঙ্গল আজ এ মরশুমের সেরা ফুটবল খেলেছে দ্বিতীয়ার্ধের ৩৫ মিনিট। আক্রমণের শানিত ফলায় এই অর্ধে ফরোয়ার্ডরা বিপক্ষ রক্ষণকে কেটেছে, বারবার।

অথচ প্রথম ৩৫ মিনিট এই একই দলের খেলার চেহারা এতটা ভিন্ন ছিল যে, না দেখলে বোঝা মুশকিল। ভুল পাস, খাপছাড়া ও যোগাযোগহীন আক্রমণ, এলোপাথাড়ি সট এবং বোঝাবুঝির অভাবে ভরা ছিল এই অর্ধের ইস্টবেঙ্গল। ফরোয়ার্ড লাইনের কেউই চোখে পড়ে না, এমনকি সাবির এবং সুরজিতও, যে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের মূল শক্তি। তাই বলে ইস্টবেঙ্গলের সামনে এই অর্ধে যে গোলের সুযোগ আসেনি, তা নয়। ১১ মিনিটে সুরজিতের কাছ থেকে বল পেয়ে সাবির দুর্বল সট করে। ২০ মিনিটে সুরজিতের কাছ থেকে সাবির বল পেয়ে মনজিতকে ঠেলে দেয়। মনজিৎ গোলকিপারের হাতে বল মারে। মনজিতকে এদিন লেফট স্ট্রাইকারের জায়গায় খেলানো হয়। তার দক্ষতাকে খাটো না করেই বলছি,



ইস্টবেঙ্গল ঃ রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব—নেটে বল, হাসিমুখে গোলদাতা সাবির, অসহায় গোলরক্ষক কিরণকে কিছু বলছে নির্মল শেঠ/পাহাড়ী

আজ সে মোটেই খাপ খাওয়াতে পারেনি। একবার মনজিতকে সুরজিত বল দিয়ে আবার ফেরৎ পায়। সটও নেয়। কিন্তু পোস্ট ঘেঁষে সেটা বাইরে চলে যায়। একটু পরে মনজিত একটি সট নেবার আগেই বিপক্ষ ডিফেণ্ডার বল বার করে দেয়। মীর সাজ্জাদ এদিন ম্লান ভূমিকায় মাঠে শুধু ঘোরাফেরা করেছে। কিছুই করতে পারেনি। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকে।

দ্বিতীয়ার্ধে সাজ্জাদের জায়গায় মিহির মাঠে আসে এবং কিছু পরে মনজিতের পরিবর্তে ডেভিড উইলিয়ামস। ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল পায় দ্বিতীয় মিনিটেই। গুরদেবের লম্বা সট থেকে বল পেয়ে সুরজিতের অপূর্ব সোয়ার্ভিং সেণ্টার গোলকিপারকে বিভ্রান্ত করে সাবিরের কাছে আসে। সাবির হেডে গোল দেয়। পাঁচ মিনিট বাদে আবার গোল। মিহিরের কাছ থেকে বল পেয়ে সুরজিৎ বাম প্রান্ত থেকে ভিতরে ঢুকে এসে ত্বরিৎ সট নেয়। বলটা গোলরক্ষক কিরণ রায়ের হাতের তলা দিয়ে গলে যায়। তৎপর সাবিরের পক্ষে সেটা গোলে ঠেলে দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। হবার কথাও নয়।

সেকেণ্ড হাফে, গোলের পর থেকেই ইস্টবেঙ্গল এক আলাদা উদ্বুদ্ধ চেহারা নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। সুরজিতের নেতৃত্বে গতির সঙ্গে হানতে থাকে আক্রমণ। সাবিরও নিজেকে ফিরে পায়। মিহির পরিশ্রমে ঘাটতি রাখে না। ডেভিড লেফট আউটে মানিয়ে খেলে। যে দেবরাজ প্রথমার্ধে শুধু ধিক্কার পেয়েছে, খেলা শেষে সে কুড়িয়েছে প্রশংসা। চাঙ্গা হয় প্রশান্তও।

দ্বিতীয় গোলের পাঁচ মিনিট পর প্রশান্তর কাছ থেকে সাবির একেবারে ফাঁকা বল পায়— একমাত্র বাধা কিরণ রায়। কিন্তু বাইরে মেরে সে হ্যাটট্রিকের সুযোগ হারায়। এরপর রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের একটি গোল শোধ হবার এবং সাবিরের হ্যাটট্রিক করার কথা আগেই লিখেছি। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে সবার পারদর্শিতার কথা স্বীকার করেও একজনের কথা আমাদের বলতে হবেই—সে অবশ্যই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এবারে ও আরও দুর্দান্ত খেলছে।

এদিন কেমন খেলেছে রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব? অবশ্যই প্রশংসা করব। কারণ এদিন ওরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে গেছে সারাক্ষণ। কখনো নিজেদের পুরোপুরি রক্ষণে গুটিয়ে নেয়নি। এবং তারই ফলস্বরূপ আজ ওরা গোল পেয়েছে। ০-২ এবং ১-৩-এ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলের ওই আক্রমণের চাপে পড়েও ওরা পাল্টা অ্যাটাকে উৎসাহ দেখিয়েছে। ওদের খেলার মধ্যে এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিল। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের খারাপ খেলার সুযোগে ওদের রক্ষণ শক্ত হতে চেষ্টা করে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেটা ভেঙ্গে পড়ে।

রেলওয়ে ফুটবল দলের গোলরক্ষক কিরণ রায় কয়েকটি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেখালেও দ্বিতীয় গোলটি তারই দোষে হয়। আক্রমণে ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ ছিল কিশোর মুখার্জি। সুযোগ বুঝেই সে এদিন সট নিয়েছে গোলে। এবং তার ফলও পেয়েছে। ক্যাপ্টেন উৎপল নিয়োগীও চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। মন্দ খেলেনি লিঙ্কম্যান সুবিমল ঘোষ। ওদের রক্ষণে ছিল বলাই চক্রবর্তী। ডিফেন্স প্রথমার্ধটা মন্দ সামাল দেয়নি। শেষ কথা, রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব আজ খেলেছে পিছপা না হয়ে এবং না দমে। রেফারির সিদ্ধান্ত মাঝে মধ্যে ভুল হয়েছে। রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের পক্ষেও মাঝখানে একজন খেলোয়াড় বদল হয়েছে, প্রবীর রায়ের জায়গায় বীরেন দাস মাঠে আসে।

ইস্টবেঙ্গল :— ভাস্কর গাঙ্গুলি, চিন্ময় চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরদেব সিং, সত্যজিত মিত্র, দেবরাজ, প্রশান্ত ব্যানার্জি, সুরজিত সেনগুপ্ত, সাবির আলি, মনজিৎ সিং (ডেভিড উইলিয়মস) ও মীর সাজ্জাদ (মিহির বসু)।

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব :—কিরণ রায়, নির্মল শেঠ, বলাই চক্রবর্তী, সুব্রত দাস, অলোক মজুমদার, সুবিমল ঘোষ, পুলক বিশ্বাস, কিশোর মুখার্জি, অরূপ দাস, উৎপল নিয়োগী, প্রবীর রায় (বীরেন দাস)।

রেফারি :—সুনীল অধিকারী।

মোহনবাগান—২ : পুলিস এ সি—০

(মানস ও তপন)

পুলিস ডিফেণ্ডাররা তেমন কিছু শক্ত বাধা না দিলেও মোহনবাগান কিন্তু জয় পেয়েছে দুই গোলে। এবং প্রতিটি গোলের পরই পুলিস গোল পরিশোধের সুযোগ পেয়েছিল। শেষ বিশ মিনিট মোহনবাগান ফরোয়ার্ডরা বারবার ধেয়ে গিয়েছিল পুলিস রক্ষণ এলাকায়। উলাগার পরিবর্ত খেলে তপন আক্রমণ লাইনকে উদ্দীপ্ত করেছে।

বিদেশ খেলেনি। গোড়া থেকেই নেমে-ছিল উলাগা বাঁ দিকের দায়িত্ব নিয়ে। গৌতম ও প্রসূনের সাহায্যে বারবার বল পেলেও শ্যাম ও উলাগা বিপক্ষ রক্ষণে গিয়ে বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিল।

মোহনবাগানের এই ষষ্ঠ খেলা ছিল আগেকার সব ম্যাচ থেকেই আলাদা। ফরোয়ার্ডরা হানা দিয়েছে কিন্তু অযথা পায়ে বেশি সময় বল রেখে বক্সের ভেতরে পুলিস ডিফেণ্ডারদের জটলা তৈরিতে সাহায্য দিয়েছে। তৈরি মুভমেণ্টগুলো পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গিয়ে কার্যকরী হয়নি জায়গা মতো প্লেয়ার দেখে ঠিক ঠিক পাস না দেবার জন্য। পুলিসের ছয় / সাতজন বরাবর ঘুরঘুর করছিল ডিফেন্স এরিয়ার এদিক-ওদিক। ওরা মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের পা থেকে বল কেড়ে নিতে পারেনি বা ভালো ট্যাকলিং-এর বাহাদুরী একবারও চোখে পড়েনি। তবু



পুলিসের রাইট ব্যাক দ্বিজেন চ্যাটার্জিকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগোতে চাইছে প্রসূন ব্যানার্জি/অরুণ মুখার্জি

গোলমুখে তৈরি বল আকছার জমা পড়েছে পুলিস খেলোয়াড়দের পায়ে। আর এ কাজে সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠা দেখিয়েছে উলাগানাথন। প্রথম দু'মিনিটে গৌতম ও পায়াস বার দুই ভালো পাস উলাগাকে দিলে সে বেমালুম জমা দিয়েছে পুলিস খেলোয়াড়দের পায়ে। পরে দিলীপ বেশ কয়েকবার ওভারল্যাপ করে লম্বা লব ঠিক পায়ে ফেললেও একইভাবে লক্ষ্যহীন পাস দিয়েছে উলাগা পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে।

পাঁচ মিনিটের সময়েই গোল হতো যদি না কম্পটনের ওভারল্যাপ থেকে পাওয়া সুন্দর উঁচু সেণ্টার মানস গোল লাইনের খুব কাছে থেকে ভলি মেরে পোস্টের উপর দিয়ে পাঠাতো।

উলাগা ছাড়াও শ্যামকে দিয়েও মোহনবাগান সুবিধা পায়নি। অবস্থা বুঝে সুব্রত বেশ কয়েকবার উপরে উঠে এসেছিল। একবার গৌতমের ফ্ল্যাগ কিক সুব্রত হেড দেয় কিন্তু গোলকিপার কল্যাণ চকিতে তা ধরে ফেলে।

তেত্রিশ মিনিট পর্যন্ত গোল পায়নি মোহনবাগান। ওই সময়েই গৌতম আবার মাপা ফ্ল্যাগ কিক নেয় ঠিক গোলমুখে। সুব্রত মাথা দিয়ে বল পেছনে দেয় মানসের কাছে। কিন্তু তার ভলি পোস্টের উপর দিয়ে চলে যায়।

পরের মিনিটে গোল হলো। পায়াসের ফরোয়ার্ড পাস থেকে মানস দুর্দান্ত সট নিলে সাফল্য আসে।

বিরতির পর উলাগার বদলে তপন নামে। পায়াসকে উইং-এ দিয়ে তপন ও শ্যামকে স্ট্রাইকার খেলিয়ে মোহনবাগান আঘাত হানতে শুরু করে। সুব্রতর লব ধরে তপনের জোরালো সট ধরে ফেলে কল্যাণ। আট মিনিটের সময়ে সাইড লাইন থেকে মানসের সেণ্টার বুকে নিয়ে চকিতে শরীর ঘুরিয়ে শ্যাম বাঁ পায়ের সট নিলে কল্যাণ আঙুল ঠেকিয়ে বাঁচায় কর্নারের বিনিময়ে। চোদ্দ মিনিটের সময়ে পুলিস সুযোগ পেয়েছিল গোল সমান করার। মিলন বড়ুয়ার উঁচু লব পৌঁছয় পেনাল্টি বক্সের ভেতরে। বকুল পাশে দাঁড়ানো সঞ্জীবের উদ্দেশ্যে ফলস দিলে সে ঠিক সময়ে সট নেয়। কিন্তু দুর্দান্ত ওই সটটি বাইরে বেরিয়ে যায় পোস্টের সামান্য পাশ দিয়ে।

তেইশ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হলো তপন মারফতে। গোলটার জন্য দায়ী ছিল পুলিস লেফট ব্যাক স্বপন সাহা রায়। মানসের ঠিক জায়গামতো সেণ্টারটি পড়লেও শ্যাম কিন্তু গোলে সট নিতে পারেনি দোনামোনা করায়। স্বপনের মিস কিক মাটিতে পড়া মাত্র ওত পেতে থাকা তপন ফাঁকা গোলে ঠেলে দেয়।

চার মিনিট বাদেই পুলিস আবার গোলের সুযোগ পায়। গোলমুখে হঠাৎ তৈরি হওয়া জটলা থেকে বলের আশপাশে ছুটে দাঁড়ায় সঞ্জীব ও প্রবীর। প্রতাপ বিপাকে পড়ে এগিয়ে এসেছিল। শুধু বলটা ইনস্টেপে সামান্য তুলে দিলেই গোল হয়—এই অবস্থায় প্রবীর বল ছাড়াই পড়ে গেল মাটিতে।

শেষের মিনিট তিনেক আগে পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে তপন ফলস দেয় পায়াসের উদ্দেশ্যে। পায়াসের দুর্দান্ত এই কোণাকুণি সটটিও ফিস্ট করে কল্যাণ।

মোহনবাগান : প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, দিলীপ পালিত, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, পায়াস ও উলাগানাথন (তপন দাস)।

পুলিস : কল্যাণ সরখেল, দ্বিজেন চ্যাটার্জি (জয়দেব চক্রবর্তী), সুবীর মুখার্জি, দীপক দাস, স্বপন সাহা রায়, তারক সাহা, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, মিলন বড়ুয়া, বকুল দাস (কৃশানু দে), সঞ্জীব দে ও প্রবীর মজুমদার।

রেফারি : রমেন ঘোষ।

মহমেডান স্পোর্টিং-২
ইস্টার্ন রেলওয়ে-০
(সানজারি-পেনাল্টি ও লতিফ)

১৪ জুন : জয় না পেলে হিংসায় মাতব—এমন আস্থা তৈরি হয়েছিল এ মরশুমে প্রথম মহমেডান ও ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলাটিতে। রেলওয়ের খেলোয়াড়রা প্রথম ৪০ মিনিট রুখে দিয়েছিল মহমেডানকে। এবং তাইতে 'জয়' নামক ঈপ্সিত বিষয়টিকে হারাবার ভয়ে হিংসার উন্মাদনায় মত্ত হতে চেয়েছিল সাদা গ্যালারির দর্শকরা।

বিরতির এক মিনিট আগে গোলমালের সূত্রপাত এবং ১৪ মিনিট ধরে চলল মাঠের একাংশে উচ্ছৃঙ্খলতা, তাণ্ডব নৃত্য। শুরু থেকে মহমেডান স্পোর্টিং যতবার বিপক্ষ রক্ষণ ভেদ করতে চেয়েছে ততবারই বাধা পেয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে ডিফেণ্ডারদের কাছ থেকে। নাজীব ও সানজারি গোলমুখে এসে নষ্ট করেছে হাবিব, সমরেশ ও লতিফের তৈরি বলগুলি। ইস্টার্ন রেলের ডিফেন্সে গৌর, সুভাষ এবং রণবীর দাস দুর্ধর্ষ ভূমিকায় ছিল সব হানা বরবাদ করতে।

প্রথম পঁচিশ মিনিট টাফ ফুটবল খেলল রেলের ডিফেণ্ডাররা। তাতে রেফারি সুনীল অধিকারীকে আঙুল উঁচিয়ে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মহমেডান অধিনায়ক হাবিব শাসাতে শুরু করল। রেফারি বার দুই সাবধান করলেও হাবিবের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি। এসময়ে রেল দল পাল্টা চাপ সৃষ্টি করে মহমেডান গোলমুখে। অরবিন্দের উঁচু সেণ্টার ঠিক পেনাল্টি বক্সের মাঝে পড়ে। একা নাসিরকে পেয়েও শ্রীকুমার গোলে সট নিতে ইতস্তত করায় অশোক ছোঁ মেরে বল কেড়ে নেয়।

এরপর প্রেমনাথ লম্বা লব ফেলে রেল গোলমুখে। সানজারি ফ্লাইট আন্দাজ করতে না পেরে হেড দিতে ব্যর্থ হয় এবং পরে হাত দিয়ে বল গোলে ঠেলার চেষ্টা করে। রেফারি তাকে সতর্ক করতেই হাবিব ছুটে গিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়। এ সময় হাবিবকেও আবার সাবধান করে দেওয়া হয়।

প্রথম অর্ধ শেষের এক মিনিট আগে ডান দিকে লতিফুদ্দিন বল ছাড়াই মাটিতে পড়ে চোট পায়। রেফারি ওকে লক্ষ্য না করেই খেলা পরিচালনা করতে থাকেন এবং ফের হাবিব তর্কে মত্ত হলে রেফারি ওকে হলুদ কার্ড দেখান। সাদা গ্যালারির সমর্থকদের এইটুকুতেই উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কারণ হল। ইঁট এবং কাঠের টুকরো ফেলা ছাড়াও ফেন্সিং ভেঙ্গে দর্শক ঢুকে পড়ল মাঠে। ধাওয়া করল লাইন্সম্যান বাসুদেব মজুমদার এবং রেলের খেলোয়াড়দের।

রেফারি অবস্থা দেখে পুলিসের সাহায্য চাইলেন। এদিন মাঠে পুলিসও কম ছিল। ডি সি (আর্মড) কালীপদ ব্যানার্জি কম শক্তি নিয়েও গণ্ডগোল থামাতে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

চোদ্দ মিনিট পর আবার খেলা শুরু হল। ➡



পুলিস বেষ্টিত রেফারি সুনীল অধিকারীকে হাবিবের প্রশ্ন কেন তাকে হলুদ কার্ড দেখান হল। পিছনে দীনকর/পাহাড়ী

দীনকরের বদলী সুভাষ এদিনই প্রথম খেলল এবং দলকে ভরসা দিল ভাল স্পিড, বল কণ্ট্রোল এবং সুন্দর ডজ দেখিয়ে।

শুরু থেকে শেষ ভাল খেলেছে প্রেমনাথও। মাঝে মাঝে ওর ওভারল্যাপ থেকে মাপা সেণ্টার আক্রমণে সাহায্য করেছে। ৪০ মিনিট বাদে মহমেডান গোল পেল পেনাল্টি মারফতে। প্রেমনাথ অরুণ ও রণবীরকে ফাঁকি দিয়ে পেনাল্টি বক্সের ভেতর বল ফেলল। সানজারি এগিয়ে যেতেই সরল হাত দিয়ে বল থামাল। সানজারি পেনাল্টিতে গোল পেল সহজেই।

রেল দলে অরবিন্দের বদলে বিমল খেললে ওরা মহমেডান গোল মুখে ধেয়ে গেল বেশ কয়েকবার। সুকান্ত একবার ফ্ল্যাগ কিক ফেলল ঠিক গোল মুখে। বিমল ফলস দিল শ্রীকুমারের উদ্দেশ্যে। শ্রীকুমার অতো কাছ থেকেও পোস্টের উপর দিয়ে সট নিল। তিন মিনিট বাদেই সুকান্তের লব পেঁছলো বিমল ও শ্রীকুমারের সামনে। বক্সের ভেতর থেকেও আবার শ্রীকুমার বাইরে মারল।

পিণ্টু একবার বল পায়ে তরতরিয়ে বক্সের ভেতরে পৌছল ডিফেন্স চিরে। সে সময় সুভাষের দুর্দান্ত সটটি গোলকিপার সুজিত ধরে ফেলে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়।

নাজীব সাংঘাতিকভাবে ফাউল করে রণবীরকে। রেফারি ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। রণবীরকে স্ট্রেচারে করে বাইরে আনতে হয়েছিল এবং ও সুস্থ হবার আগে ৩ মিনিট রেল খেলে দশজনকে নিয়ে।

মহমেডান দ্বিতীয় গোল পায় লতিফ মারফতে। হাবিবের মাঝ মাঠ থেকে পাঠানো উঁচু লব পেনাল্টি বক্সের সামান্য দূরে পড়তেই লতিফ ধরে। লতিফ ছিল রেলের দুই স্টপারের মাঝখানে। বল ধরে ছুটে এসে সুন্দর কোণাকুণি সটে লতিফ গোল করে।

শেষদিকে বিমলের একটা সট মুস্তাফা হাত দিয়ে থামায় পেনাল্টি বক্সের ভেতরেই। রেফারি সেটা লক্ষ্য করেননি।

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ নাসির, ফিলিপ, মইদুল, অশোক চক্রবর্তী, মুস্তাফা, সমরেশ চৌধুরী ও হাবিব, লতিফুদ্দিন, নাজিব, সানজারি (খাবাজি) ও দীনকর (সুভাষ)।

ইস্টার্ন রেল ঃ সুজিত মুখার্জি, গৌর পাত্র, সরল গাঙ্গুলি, সুভাষ খাঁড়া ও অলোক মুখার্জি, রণবীর দাস ও অরুণ রায়, কালিপদ হালদার, শ্রীকুমার চ্যাটার্জি, অরবিন্দ মুখার্জি (বিমল দাস) ও সুকান্ত ভট্টাচার্য (প্রবীর মজুমদার)।

রেফারি ঃ সুনীল অধিকারী।

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় ও রেখা ঃ জি সান্তা





পাদপ্রদীপের আলোয়

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



বড় হতে গেলে তাকে কত পরিশ্রম করতে হয়, কত সাধনা করতে হয় তা জানেন তিনিই—যিনি সব কিছু ত্যাগ করে লক্ষ্যে পৌঁছান। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী—কেউই এর বাইরে নন। বাইরে নন খেলোয়াড়রাও। 'পাদপ্রদীপের আলোয়' পর্যায়ে আমরা তাদের কথাই ধারাবাহিকভাবে জানাবো যারা খেলাকে ধ্যান-জ্ঞান করে বড় হয়েছেন। জানাবো তাদেরই কথা—যারা ওই তারকাদের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে জীবনপাত করে চলেছেন।



ছেলেটি তখন অচেনা। সতেরো চলছে এবং সদ্য পেরিয়েছে স্কুল ফাইনালের কোঠা। বাঘা সোম এরিয়ান ক্লাবের তখনকার ফুটবল সেক্রেটারি বলাই মিত্রের সঙ্গে বসে একদিন খেলা দেখছিলেন। খেলা চলছিল এখনকার ইস্টবেঙ্গল—এরিয়ান এজমালী মাঠে। আই এফ এ শিল্ড প্রতিযোগিতার খেলা। সেটা '৫৩ সাল। জামসেদপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে ছেলেটি খেলতে এসেছে, খেলা হিন্দুস্তান এয়ার ক্র্যাফটের সঙ্গে। জামসেদপুর ৩—২ গোলে ম্যাচ জিতল। তিনটির মধ্যে রয়েছে ছেলেটির দেওয়া দুটি গোল।

গ্যালারিতে বসে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অত্যন্ত মনযোগে প্রতিটি খেলোয়াড়ের ভূমিকা তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

খেলা তখন সমাপ্তির দিকে। একসময় বলাইবাবু বলে উঠলেন—'বাঘাদা, ওদের লেফট লাইনের প্লেয়ারটিকে আগামীবার দলে নেওয়া যেতে পারে—কি বলেন!'

—'না'—তার স্পষ্ট স্বর ধ্বনিত হল—'তুই জামসেদপুরের ওই রাইট আউটের খেলোয়াড়টিকে বরং দলে নে। হি ইজ রিয়েলি গুড, রিয়েলি গুড।' —শান্ত জবাব, কিন্তু শেষের কথা ক'টি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া।

—'আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই ট্রাই করব।' নিশ্চিন্ত জবাব ঝরে পড়েছিল বলাইবাবুর কণ্ঠ থেকে।

কিন্তু বেশ কিছুদিন পর একদিন বলাই মিত্র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'না, বাঘাদা, সম্ভব হল না। ছেলেটি না কি মোহনবাগানে যাচ্ছে।' বাঘা সোম চুপ।

ছেলেটি মোহনবাগানে গেল। কারণ, মোহনবাগান আগে থেকেই তাকে দলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। বিহারে খেলতে গিয়েছিল মোহনবাগান। সেখানেই ছেলেটি নজর কেড়ে নেয় তাদের। এছাড়া '৫৩-র কলকাতা জাতীয় ফুটবলে বাংলার বিপক্ষে বিহারের এই কনিষ্ঠ ফুটবলারটি এমন খেলেছিল যে, ওর উপর কর্মকর্তাদের নজর হওয়া স্বাভাবিক। হয়েও ছিল। পাল তোলা নৌকোয় পা রাখল সে।

কিন্তু মোহনবাগানে ওর খেলার সুযোগ মিলল না। দলে ছিলেন ভেঙ্কটেশ। এবং দুর্ভাগ্য, ছেলেটি ছিল ভেঙ্কটেশের জায়গারই খেলোয়াড়—রাইট আউট। ভেঙ্কটেশ তখন তার প্রখর দীপ্তি নিয়ে বিরাজ করছেন ভারতের ফুটবল মানচিত্রে। কোন আশার আলো দেখল না ও। ছেলেটিকে সেদিন তাই ফিরে আসতে হয়েছিল শূন্য হাতে, রিক্ত মনে। চোখের কোণে জমে ছিল অভিমানের কান্না, ভবিষ্যৎটাকে মনে হয়েছিল কি রকম ঝাপসা, অস্পষ্ট।

অতঃপর সে আশ্রয় হিসাবে বেছে নিল এরিয়ান ক্লাবকেই। কারণ, এরিয়ানের দরজাও খোলা ছিল ওর জন্য। এরিয়ানের জামা গায়ে চাপিয়ে মাঠে নামল সে। সবুজ মাঠ। এবং ছেলেটি মনে মনে বিড় বিড় করল—'এই কলকাতাতে এর আগে জাতীয় ফুটবলে বিহারের হয়ে এবং আই এফ এ শিল্ডে জামসেদপুরের হয়ে শুধু খেলেছি। সেটা একটা অধ্যায় গেছে। এবার শুরু হচ্ছে আর একটা লম্বা অধ্যায়।' ঠিক এই মুহূর্তে এখান থেকে তাকে নতুন সংগ্রাম শুরু করতে হবে, সাফল্যের সোপান তৈরি করার এবং প্রতিষ্ঠার আলোয় নিজেকে দাঁড় করাবার জন্য। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু আশা বুঝি বিফল হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেটি সফল হতে পারছে না। একটা ব্যর্থতার গ্লানি এবং হাহাকার ওর বুকে চেপে বসছে। বিশাল কলকাতার এই অপরিচিত পরিবেশে বিহার-আগত অনভিজ্ঞ ছেলেটি মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। তবু উঠে দাঁড়াবার জন্য লড়াই করছে প্রাণপণ। জামসেদপুরের চাকরি ছেড়ে এসেছে, এখনো নতুন চাকরি জোটেনি। কোনরকমে মাথা গুঁজে রয়েছে সে। একটা অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণার ঘুণপোকা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। ও ভাল খেলতে পারছে না। এমন একজন মনের মত লোকও নেই, যার কাছে সে প্রাণ খুলে বলতে পারে—কেন আমি ভাল খেলতে পারছি না। এমনি করেই কি ওর সামনে অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার নেমে আসবে?

একদিন বাঘাবাবু 'বলাই'কে জিজ্ঞেস করলেন—'ছেলেটি কেমন খেলছে?'

—'না, বাঘাদা, সে রকম খেলতে পারছে না।'

—'ঠিক আছে, আমি একদিন ওর খেলা দেখব।'

একদিন তিনি ওর খেলা দেখতে মাঠে এলেন। এরিয়ানের খেলা, ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে। দেখলেন। এদিনও সুবিধা করতে পারল না ছেলেটি।

কেন সে ভাল খেলতে পারছে না? —প্রশ্নটি খেলা চলাকালীন সর্বক্ষণ তার মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে ফিরেছে। কোন কারণ ছাড়া ছেলেটি এ'রকম খেলতে পারে না। সম্ভব নয়। কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু কি সে কারণ?

খেলা তখন ভেঙে গেছে। গুটি গুটি পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ছেলেটির কাছে। জানতে চাইলেন—'খেলতে পারছো না কেন?' অকপটে ছেলেটি বলল—'আমার অ্যাঙ্কেলে চোট। তাই কিছুতেই নিজের স্বাভাবিক খেলা আমি খেলতে পারছি না। কিছুতেই না।'

তিনি তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন। যে সংশয়ের কাঁটাটা তাকে খোঁচা দিচ্ছিল, ঠিক সেটাই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ছেলেটির ভাল না খেলার কারণ অবশ্যই পায়ের গণ্ডগোল। সারাক্ষণ মাঠে বসে তিনি সেই কারণই অন্বেষণ করে গেছেন।

তাই বললেন, 'তাহলে তুমি খেল কেন?'

এবার ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা সরল না ওর মুখ থেকে। সস্নেহে বাঘা সোম বললেন—'পায়ে ব্যথা নিয়ে খেলো না. খেলা কখনই উচিত নয়। এতে তোমার স্বাভাবিক খেলা তুমি খেলতে পারছ না, ব্যথাও প্রশমিত হচ্ছে না। আগে চোট সারুক, তারপর খেলবে। দেখবে, আগের খেলা তুমি ফিরে পাচ্ছো। কিন্তু তারও আগে সুস্থ হওয়া একান্ত দরকার। তাই তোমার এখন চাই বিশ্রাম। ব্যথা থেকে আরোগ্য লাভ করে তবেই তুমি আবার সবুজ মাঠে পা ফেলবে। এবং তখন স্পষ্টতই দেখবে, তুমি কত ভাল খেলতে পারছ। কোন আড়ষ্টতা থাকবে না—স্বচ্ছন্দে ড্রিবল করছ, সট করছ, পাস দিচ্ছ।'

ইনি কে? এমন কথা তো এর আগে আমাকে আর কেউ বলেননি? এমন সহানুভূতি আর স্নেহধারা আর কেউ তো আমার

উষর মনে ছড়িয়ে দেননি? আমার ব্যর্থ হবার আসল কারণটা আর কেউই তো এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেননি? —ওর চোখের কোণে চিকমিক করে উঠল জল।

বাঘা সোমের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল—ছেলেটি ভাল খেলবেই। তাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছেন—'দ্য বয় উইল কাম আউট, মাস্ট কাম আউট।'

ব্যথা সেরে যাবার পর ছেলেটি আবার মাঠে নামল। এবং এবার ওর অন্য রূপ। আগের সঙ্গে পার্থক্য দেখা গেল এবারের চেহারার। আর ব্যর্থতা নয়, শুরু হল 'জয়'। খোলস থেকে ছেলেটি বেরিয়ে আসতে লাগল দক্ষতার পূর্ণ ডালি নিয়ে। সে বেরিয়ে আসবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বাঘা সোম! আসলে যাকেই তিনি বলেছেন সে বড় হবে। সে বড় হয়েছে। আর যাকে বলেছেন, এর দ্বারা কিছু হবে না, তাকে তিনি কাছেই ডাকেননি।

তিনি ঠিক করে রেখেছেন ছেলেটিকে ইস্টার্ন রেলে নিয়ে আসবেন। একদিন খেলা ভাঙার পর টেণ্ট থেকে সে যখন বেরোচ্ছিল, বাঘাবাবু এগিয়ে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি রে, ইস্টার্ন রেলে খেলবি? —চাকরি করবি?' নিস্তরঙ্গ অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ সূর্যের ঝলকানিতে চমকে উঠল সে। এগুলো কি শুনছে ও? এমন অভাবিতভাবে ওর সামনে চাকরির দরজা খুলে যাবে, মিনিট খানেক আগেও ধারণা করতে পারেনি সেটা। বিস্ময়মাখা মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির দিকে তাকাল, বলল—'করব। তবে বাবাকে একটু জিজ্ঞেস করে নিই। তার অনুমতি নেওয়াটা দরকার। সব কাজেই আমি তা নিই।'

সম্মতি মিলল বাবার কাছ থেকে। এবার ছেলেটির আশ্রয় স্থল হল ইস্টার্ন রেল। টিকিট কালেক্টরের চাকরি নিয়ে সেখানে ঢুকল ও। জীবনের একটা নিরাপত্তা বিধান হল ওর, দাঁড়াবার একটা জায়গা পেল। শুরু হল ওর ফুটবল জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। পরিশ্রম আর অনুশীলনের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এবং একটার পর একটা সাফল্য কুড়িয়ে নেওয়া ওর এই অধ্যায়টাকে ভরিয়ে রেখেছে নাটকীয়তা ও উজ্জ্বলতায়।

অমানুষিক খাটতে আরম্ভ করল ছেলেটি। বাঘাবাবুও ওর কাছ থেকে সব বের করে নিতে লাগলেন। দেয়ালে গোলপোস্ট এঁকে মধ্যে এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় সংখ্যা লিখে তার উপর চলতে লাগল টারগেট সুটিংয়ের প্র্যাকটিস। শ'য়ে শ'য়ে ছেলেটি সট করতে লাগল—কখনো এক, কখনো দুই, কখনো তিন বা চার-পাঁচ-ছয়ে। সট করতে করতে কুঁচকি ওর ফুলে গেছে। চিৎকার করে বলেছে—'আর পারছি না বাঘাদা, পারছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠেছেন বাঘা সোম—'না, না—থামলে চলবে না। পারতে হবে, পৌছতে হবে পারফেকশনে। আমি পারফেকশন চাই।' জ্বর হয়েছে, তবু প্র্যাকটিস থামেনি। তারপর একদিন গুরু কপালে হাত দিয়ে যখন বুঝলেন, এখন যা জ্বর, এই অবস্থায় অনুশীলনের ধকল শরীর নিতে পারবে না, তখন বিশ্রাম মঞ্জুর করলেন তিনি। এবং শুধু মঞ্জুর করাই নয়, ওই অবস্থায় বারংবার ওর শরীরের খবর নেওয়া এবং ওকে দেখাও ছিল তার আর এক প্রধান কাজ। কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হয়ে গেল ওর সাধনা। নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। আর ওর এই চলার প্রয়াসকে সব দিক দিয়ে গতি ও ছন্দময় করে তুললেন বাঘা সোম।

ছেলেটির চোখে স্বপ্ন ছিল, বুকে ছিল প্রতিজ্ঞা। প্রচণ্ড খাটুনিতে কোন ফাঁকির কারচুপি নেই। কারণ ও জানে, জামশেদপুর ছেড়ে অপরিচিত কলকাতায় এসে একটা অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়িয়েছে সে। বাধা আসবে, কিন্তু লড়াই করে সেগুলোকে দূরে সরিয়ে নিজেকে বিরাট করে তুলতে হবে, পৌছতে হবে সাফল্যের ঠিকানা লেখা প্রাসাদে। আর তা না হলে ওকে তলিয়ে যেতে হবে সব পরিচয় হারিয়ে। কেউ খুঁজবে না তখন।

তাই, তিলে তিলে নিজেকে প্রস্তুত করল সে গুরুর সাহচর্যে, বাঘা সোমের সান্নিধ্যে, তার পিতৃস্নেহে। দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করাল নিজেকে। এবং অতঃপর শুরু হল ওর জয়যাত্রা।

'৫৫-র জাতীয় ফুটবলে বাংলার হয়ে দিগ্বিজয় শুরু। ওই বছরই চারদেশীয় এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার ট্রফি প্রতিযোগিতায় খেলতে ঢাকা অভিযান। এবং দুর্দান্ত ও অসাধারণ সাফল্য লাভ। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তার নামের পাশে গোল।

সামাদ তখন ঢাকায়। কোয়াড্রাঙ্গুলারে ছেলেটির খেলা দেখে তিনি তাজ্জব। পরবর্তীকালে তিনি একবার কলকাতায় এলেন, যথারীতি দেখা হল বাঘাবাবুর সঙ্গে। দেখা হতেই ভারতীয় ফুটবলের অনন্য সাধারণ গৌরব সামাদ তার পুরোনো বন্ধুকে উচ্ছ্বাসমাখা গলায় বললেন—'ইয়ার, তুম একঠো লেড়কা পয়দা কিয়া না! ও বহুৎ আচ্ছা খেলা—বহুৎ আচ্ছা!'

অবাক চোখে বাঘা সোম বললেন—'তুই কোন খেলোয়াড়টার কথা বলছিস্?'

—'আরে, ওই যে রাইট লাইনের খেলোয়াড়টা—হাউ-ওয়াণ্ডারফুল!'

গর্বে বাঘাবাবুর সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। আবেগ-মণ্ডিত সামাদ সাহেবের গলার স্বর শোনার পর একটা নির্মল আনন্দ ও দারুণ তৃপ্তি আচ্ছন্ন করল তাকে। ঢাকা কোয়াড্রাঙ্গুলারে নতুন প্লেয়ারটির ভাল খেলা নিজেকে আনন্দ দিয়েছে, মুগ্ধ করেছে সামাদ সাহেবকে কিন্তু সবচেয়ে বেশী খুশীতে রাঙিয়েছে বাঘা সোমের ভিতরটাকে।

এই ছেলেটির পরবর্তীকালের সাফল্যের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। তবে একটা ঘটনা হয়তো অনেকেরই অজানা।

'৫৭ সালে ফারইস্ট ট্যুরে গিয়েছিল ভারত। বাঘাবাবু দলের সঙ্গে গেছেন, সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে তার প্রিয় শিষ্যও। শিষ্যের খেলা দেখে হংকং ও ফরমোজার কর্তাব্যক্তিরা তাদের দলের হয়ে ওকে খেলার প্রস্তাব দেন, সঙ্গে থাকে কয়েক হাজার ডলারের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি। ওখানকার সেরা খেলোয়াড়দের যে টাকা দেওয়া হয়, তার থেকেও প্রতিশ্রুত টাকার অঙ্ক ছিল বেশী। এবং বাঘাবাবুকেই ওরা এ ব্যাপারে সেরা মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেন। ধরলেন তাকে। প্রিয় ছাত্রের প্রতিভার এত বড় স্বীকৃতিতে বাঘাবাবু গর্বিত। কিন্তু মুখে তার এতটুকু ভাব না এনে নির্লিপ্ত স্বরে ফরমোজা—হংকং কর্মকর্তাদের তিনি জানিয়ে দিলেন—'না, না, ও তো আর বিক্রি করার সামগ্রী নয়। ও আমাদের প্রাণের ধন। আমরা ওকে কি করে আপনাদের দিই বলুন!' তার এই একটি উত্তরেই ওখানকার কর্তাব্যক্তিরা আসল মানুষটিকে চিনে নিতে পেরেছিলেন।

তেইশ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর একদিকে মাঠের মধ্যে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, অন্যদিকে লড়তে হয়েছে ভাইদের বড় করার জন্য। একদিন দুটোতেই তিনি সফল হলেন। উঠে এলেন মঞ্চে। হাত নাড়লেন। প্রশংসা, সুনাম আর অভিনন্দন ধ্বনি ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার প্রতি। টিকিট কালেক্টর থেকে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আজ তিনি ইস্টার্ন রেলের অ্যাসিস্টেণ্ট পারসোনাল অফিসার।

—ফুটবল জগতের এই বীর সৈনিকের নাম কি? —প্রদীপ ব্যানার্জি। লক্ষ ভারতীয় ফুটবলানুরাগীর যাকে একটি ছোট্ট উচ্চারণে চিনে নিতে কোন চিন্তার মধ্যে পড়তে হয় না—'পি কে'।

বিয়র্ন বর্গ কি আবার উইম্বলডন জিতবেন

লণ্ডন থেকে সুব্রত সরকার

বিয়র্ন বর্গ কি আবার উইম্বলডন সিঙ্গলসে জিততে পারবেন? এবং পরপর চারবার? ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা শুরু হওয়ার পর আর এরকম হয়নি। যদিও এখানে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারের কথা এসে পড়তে পারে। লেভার কার্যত চারবারই উইম্বলডন জয় করার চেষ্টা করে সফল হয়েছেন এবং পরপর। প্রথমে তিনি ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে জয়ী হন। পরে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে আবার দু'বার চ্যাম্পিয়ন। এর মধ্যে পাঁচ বছর রড লেভার উইম্বলডনে যোগ দিতে পারেননি। কারণ তখন তিনি পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড়। উইম্বলডনের দরজা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড়দের কাছে বন্ধ ছিল।

গত ৬ জুন বিয়র্ন বর্গের ২৩ বছর বয়স পূর্ণ হল। উইম্বলডন জয় করার ব্যাপারে বিয়র্নের সব সময় উদগ্র বাসনা। কাজেই নিঃসন্দেহে এবারও তিনি ফেবারিট। তবে জিমি কোনর্স, জন ম্যাকেনরো ও ভিটাস গেরুলাইটিস সকলেই আমেরিকান যুবক। যারা এবার সুইডেনের ওই তরুণের দাপট ভেঙে দিতে চাইবেন।

আমার কাছে এছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় সেমিফাইনালে যেতে পারবেন—মনে হচ্ছে না। তবে আর্জেন্টিনার গিলেরমো ভিলাসের কথাটা উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়, যদিও ভিলাস ঘাসের কোর্টে খুব একটা সুবিধে করতে পারেন না। ইলি নাসতাসের কথাও উল্লেখ করা উচিত। প্রতিভার দিক থেকে কোন ঘাটতি না থাকলেও নাসতাসে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের ওপর যে মানসিক চাপ পড়ে তা সব সময় সহ্য করতে পারেন না।

যাদের এতক্ষণ নাম করলাম তাদের বাদ দিয়ে বাঁ-হাতি আমেরিকান খেলোয়াড় রসকো ট্যানারের কথা হিসেবের মধ্যে আনা যায়। তবে সবটাই নির্ভর করছে তার সার্ভ করার নিশ্চয়তার ওপর। এর ওপর আবার যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে ট্যানারকে আর কোনরকম হিসেবের মধ্যে আনা যাবে না।

আবার সম্ভাব্য চারজন সেমিফাইনালিস্টদের কথায় ফিরে আসি। বর্গ উইম্বলডন জয় করার জন্য আত্ম নিবেদন করেন বললে ভুল হবে না।

কোনর্স যেদিন ভাল খেলতে শুরু করেন, তখন অপরাজিত থাকেন। বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষের সার্ভিস তিনি প্রচণ্ড জোরে



উইম্বলডন কাপ

ফেরাতে শুরু করেন। কিন্তু মুস্কিল হল কোনর্স মাঝে মাঝেই খেলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এরকম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান এবং নিজের খেলা নষ্ট করেন।

গেরুলাইটিস ও ম্যাকেনরো দুজনেরই টেনিস খেলার হাতেখড়ি ও শিক্ষা হয়েছে বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান কোচ হ্যারি হপম্যানের কাছে। এর মধ্যে গেরুলাইটিস এখন তিনবার উইম্বলডনের রানার্স ফ্রেড স্টোলির কাছে কোচিং নেন। ম্যাকেনরো গত জানুয়ারিতে কলগেট কোম্পানির আয়োজিত নিউইয়র্কে মাস্টার্স টুর্নামেন্টে এবং ডালাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব



বিয়র্ন বর্গ

টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। ম্যাকেনরো এখন বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে টেনিস কোর্টে সবচেয়ে সৎ আচরণের জন্য সুনাম অর্জন করেছেন। আর একথা স্বীকার করতে হবে ম্যাকেনরো ২০ বছর বয়সে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে একদিন তিনি উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবেন। দু'বছর আগে উইম্বলডন শতবার্ষিকী বছরে এখানে এসে দেখেছি ম্যাকেনরো সেমিফাইনালের দরজা থেকে ঘুরে এসেছেন। ওই বছরই গেরুলাইটিস সেমিফাইনালে বর্গের সঙ্গে পাঁচ সেটের লড়াইতে পরাজিত হন। ওই সেমি-ফাইনালে গেরুলাইটিস জয়ী হলে সেবার উইম্বলডন-চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন। এবারেও হয়ত গেরুলাইটিস চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন না। ১৯৭৯ উইম্বলডনে প্রথম চারজনকে আমি এইভাবে দেখতে পাব বলে আশা করছি। বর্গ, ম্যাকেনরো, কোনর্স ও গেরুলাইটিস।

জুনের প্রথম দশ দিনের লণ্ডনের আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে এবার উইম্বলডন হয়ত ঠাণ্ডা বাতাস ও মেঘলা দিনে হবে। কারণ আজকের ক্লে কোর্ট ও কৃত্রিম টার্ফের যুগে উইম্বলডনই একমাত্র ঘাসের কোর্টে হয়। আর ঘাসের কোর্ট মানেই যেন ইংল্যাণ্ডে টেনিস খেলা। অবশ্য উইম্বলডন ছাড়া আরও দুটি প্রতিযোগিতা ইংল্যাণ্ডে ঘাসের কোর্টে হয়। পশ্চিম লণ্ডনে কুইনস ক্লাব এবং সারে কাউন্টিতে সুরবিটান টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনের আগে হয়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে রমানাথন কৃষ্ণাণ কুইনস ক্লাব প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন।

বিজয় অমৃতরাজ সম্পর্কে এখনও অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন। একথা সত্যি যে পাঁচ ছ'বছর আগে বিজয় সম্পর্কে অনেকে আশা পোষণ করতেন। কিন্তু এক ১৯৭৩ সাল ছাড়া বিজয় আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় রাউণ্ডের বেশী এগুতে পারেননি। ওই বছর বিজয় কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন।

রমেশ কৃষ্ণাণ সদ্য সমাপ্ত জুনিয়র ফ্রেঞ্চ লন টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে সরাসরি উইম্বলডনে প্রতিযোগিতা করার অধিকার লাভ করেছেন। আনন্দ অমৃতরাজ ও শশী মেননদের হয়ত প্রাথমিক পর্যায়ে খেলতে হবে। রমেশের এবছরই বালকদের প্রতিযোগিতায় যোগদান করার অধিকার হয়েছে। রমেশ জুনিয়রদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন বলে আশা করা যায়।




সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মিক্সড টিম (১৯৭৭)

সরকার একটু এগোলেই কলকাতায় সাঁতারুদের কল্লোল বয়ে যেতে পারে

বিশেষ প্রতিনিধি : আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভারতের নয়টি রেল সংস্থার মধ্যে পশ্চিম বাংলার দুটি রেল অর্থাৎ ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষই সাঁতারুদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক। সম্ভবত সেই কারণেই গত বিশ বছরে আন্তঃরেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় এই দুই রেলের বাঙালী সাঁতারুদের ভূমিকা সর্বভারতীয় স্তরে সকলের শীর্ষে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় রেলের সাঁতারুরা জাতীয় প্রতিযোগিতায় যে বিশিষ্ট আসন দখল করে আছে তার মূলেও ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলের সাঁতারুদের কৃতিত্বই সর্বাধিক।

বাংলার দুই রেল সংস্থার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ক্রমশ ভারতীয় রেল সংস্থার আঞ্চলিক শাখাগুলিতেও সাঁতারের প্রচলন। ভারতের বিভিন্ন দিকে গজিয়ে ওঠে আধুনিক ওলিম্পিক মানের সুইমিং পুল। দিল্লি, গোরক্ষপুর, বারানসীতে রেলের নির্মিত সুইমিং পুলগুলি শুধু আধুনিক মানের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেরও। অথচ গত বিশ বছরে ওইসব অঞ্চলে সাঁতারের চর্চা দানা বেঁধে ওঠেনি। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যেখানে সাঁতারের চলন সবচেয়ে বেশী, সাঁতারের মান যেখানে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক সেখানে উৎসাহ যোগানোর জন্য গত বিশ বছরে একটিও সুইমিং পুল নির্মিত হল না। ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন-এর সাঁতারুরা ভারতের মধ্যে সেরা প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সাঁতার অনুশীলনে তাদের যথাযথ ব্যবস্থা নেই।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রেল সংস্থার অধীনে সুন্দর সুন্দর সুইমিং পুলগুলিতে জাত-সাঁতারুর কোলাহল নেই। সাঁতার শেখার প্রবণতাও সেখানে মাদকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। পড়ে থাকা সেইসব সুইমিং পুলে সাঁতারের চর্চা না হওয়ার ফলে সুইমিং পুলগুলি ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়ছে। সুইমিং পুল হওয়া সত্ত্বেও ওইসব অঞ্চলের সেরা সাঁতারুদের রেলে চাকরির সুযোগ না থাকায় সুইমিং পুলগুলি বিলাসিতার উপকরণ হিসাবে শোভা বর্ধন করছে। বহু বছর আগে শুনেছিলাম ইস্টার্ন রেলের ওয়ার্কস প্রোগ্রামের আওতায় শিয়ালদহ অঞ্চলে একটি আধুনিক ওলিম্পিক মানের সুইমিং পুল তৈরীর প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও কিছু হয়নি।

আর এই না হওয়ার ফলে রেলের সাঁতারু মহলে ক্রমশই হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। রেলে প্রতি বছর প্রতিভাবান সাঁতারুদের চাকরি দিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে কিন্তু প্রতিভা বিকাশের জন্য উপযুক্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিভা বিনষ্ট হতে বসেছে। রেলের সাঁতারু মহলে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি রেল ও বাংলার সাঁতারুদের নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে নানান রাজনীতি-দানা বেঁধে উঠেছে। চাকুরে অ-চাকুরে সাঁতারুদের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে কিছু দুষ্টচক্র ক্রমশই এই রাজ্যের সাঁতারের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলছে। বাংলার সেরা রেলের সাঁতারুদের রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এই রাজ্যের সিনিয়র সাঁতারের মান নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ সাঁতারের অনুশীলনের জন্য কলকাতার সাঁতারের ক্লাবগুলির অনুমতি চেয়ে দরজায় দরজায় ধর্না দিয়ে যায় প্রতি বছর। কারণ কলকাতায় নতুন করে অনুশীলন উপযোগী জলাশয় নেই। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা দেখেছি টালা পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক, হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার, ভবানীপুর ও রবীন্দ্র সরোবরের লেক অঞ্চলে মোট সাতাশটি ক্লাবের মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছেলেমেয়ে প্রতি বছর সাঁতার শেখার সুযোগ পায়। ওই জলাশয়গুলিতে নতুন করে ক্লাব তৈরির সুযোগও খুব কম।

কিন্তু এছাড়াও কলকাতার পড়ে থাকা পুকুরগুলিতে এখনও অনেক ক্লাব করার যথেষ্ট সুযোগ আছে—পুর-প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলে। বাঙ্গুর অঞ্চলে ভি আই পি রাস্তার পাশে লেকের মতন টানা লম্বা জলাশয়গুলিতে এখুনি অন্তত দশ থেকে পনেরটি সাঁতারের ক্লাব হওয়ার অবকাশ রয়ে গেছে। লেক-টাউন অঞ্চলেও বড় বড় পুষ্করিণী বা জলাশয়ে সাঁতার উপযোগী পরিবেশ আছে। স্থানীয় লোকেরা সচেষ্ট হয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেই সাঁতারের ক্লাব গজিয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি গজেন রায়চৌধুরী, নরেন সাহা এবং চন্দ্রবাবুর সহযোগিতায় বাঙ্গুর অঞ্চলে এভিনিউ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন জন্ম নিয়েছে গত পয়লা বৈশাখ। স্থানীয় ছেলেদের উৎসাহে এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সুনীল মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয় এম এল এ-র সহযোগিতায় ছ'মাসের মধ্যেই সেখানে শ'খানেক ছেলেমেয়ে সাঁতার শেখার সুযোগ পাবে প্রতিদিন।

ইস্টার্ন রেল গত বছরে ওয়েলেসলি স্কোয়ারের সংস্কার করে যেখানে সাঁতার অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিল পুর প্রতিষ্ঠানের কাছে। কিন্তু সাড়া মেলেনি। আরও একটু এগিয়ে গেলে মিন্টো পার্ক, লাউডন স্কোয়ারে খুব উন্নতমানের অনুশীলন ক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারে। রাজ্য সাঁতার সংস্থা গত তিনবছর ধরে লাউডন স্কোয়ারে তাঁবু গড়ার অনুমতি পেয়েও কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের

অনুমতি পায়নি।

বেলেঘাটার লেক বিরাট। সেখানেও সাঁতার অনুশীলনের যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। সি আই টি কর্তৃপক্ষ লেকে নৌকা বিহারের জন্য ভাল পাকা বাড়ি তৈরি করে রোয়িং ক্লাব গড়তে চেয়ে স্থানীয় লোকের উৎসাহ পায়নি। রোয়িং ক্লাব গড়তে হলে নৌকার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়—যেটা সাঁতারের অনুশীলনে হয় না। সুতরাং সাঁতারের ক্লাবের জন্য জলাশয়ের পাড়ে ক্লাব গড়ার অনুমতি দিলে ওখানে এখনও অনেক উৎসাহী লোক পাওয়া যাবে। কলকাতায় ওলিম্পিক মানের একমাত্র সাধারণের সাঁতারের সুইমিং পুলটি সুভাষ সরোবরের ওই অঞ্চলে অবস্থিত। সুতরাং ওই অঞ্চলে কম পয়সায় পুকুরে সাঁতারের সুযোগ নিতে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠবে—যদি সুভাষ সরোবরের লেকে সাঁতারের ক্লাব গড়ে ওঠে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দুই পাশে বাঁধানো জলাশয়ে ব্রিটিশ আমলে আধুনিক সুইমিং পুল ছিল। সেখানে আবার সাঁতারের আসর বসাতে পারলে সারা কলকাতাকে আকৃষ্ট করা যাবে। আর বাংলার সাঁতারও ময়দানমুখী হয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। ময়দানে অনুশীলনের ও বিভিন্ন খেলার খেলোয়াড়রাও খেলার শেষে স্নানের সুযোগ পেয়ে পরিচ্ছন্নভাবে বাড়ির পথে পা বাড়াবে প্রফুল্ল চিত্তে। এ ছাড়াও সর্বস্তরের খেলোয়াড়ের পক্ষেই সাঁতার কাটা পরিপূর্ণতার একটা অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত মতবাদ।

আরও একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে 'বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগে' প্রতি বছর মাছ ধরার জন্য জলাশয়টিকে ইজারা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে সাঁতার কাটার সুযোগ থাকলে অফিসে চাকরিরত সমস্ত নাগরিক বাড়ি ফেরার পথে ক্লান্তি দূর করার সুযোগ পেয়ে আনন্দ উপভোগ করবে। বিশেষ করে চাকুরে সাঁতারুরাও ওখানে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে সাঁতারের মানকে আরও উন্নত করতে পারবে। এছাড়াও ওখানে অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বিভিন্ন অফিসে নতুন সাঁতারুদের চাকরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে গেছে। হেদুয়া ও কলেজ স্কোয়ারের গোটা পরিবেশ থেকে বাংলার সাঁতারও নতুনত্বের স্বাদে উচ্চারিত হয়ে উঠবে। নাগরিক স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করলেও বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগে সাঁতারের প্রচলন সকলকে উৎসাহিত করবে—সাঁতারু-মুখী করে তুলতে।

বালিগঞ্জের রবীন্দ্র সরোবরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাত্র দু-তিনটি সাঁতারের ক্লাব আছে। লেকের দুই পাড়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এখনও বহু ক্লাব হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। লেকের টালিগঞ্জ ব্রিজের মুখে ভাল সাঁতার কাটার সুযোগ পেতে পারে।

বাংলার সাঁতারকে কুক্ষিগত কিছু লোকের কবল থেকে মুক্ত করতে হলে আশু প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের। এবং সেই সঙ্গে নতুন পরিবেশে সাঁতার কাটার সুযোগ সুবিধাও করে দিতে হবে। বিশেষ করে চাকুরে সাঁতারুদের সাঁতার কাটার সুযোগ করে দিতে না পারলে ভবিষ্যতে সাঁতারুদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং বাংলার সাঁতারের কৃতীরা কেবল চাকরি পাওয়ার অপরাধে অপবিত্র হয়ে অনুশীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা না গেলে সাঁতারের ভবিষ্যত অন্ধকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উপরোক্ত জলাশয়গুলিতে সাঁতার অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়ার সরকারী প্রতিশ্রুতি পেলেই ইস্টার্ন রেল, সাউথ ইস্টার্ন রেল, ফুড কর্পোরেশন, পি অ্যাণ্ড টি, রাজ্য পরিবহন, স্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংস্থা এগিয়ে আসবে তাদের সাঁতারুদের অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে। একমাত্র বাংলার দুটি রেল ছাড়া অধিকাংশ সংস্থাই সাঁতারুদের চাকরি দেওয়া বন্ধ করেছে—অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে না পারায়। সুতরাং রাজ্য সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গীই একমাত্র বাংলার সাঁতারুদের বেঁচে থাকার অধিকার দিতে পারে।

ময়দানে চিকিৎসার সুযোগ কতটুকু

সুভাষ দত্ত : কলকাতা ফুটবলের হৃদপিণ্ড ময়দান। তাই খেলোয়াড়, রেফারি, আর খেলা-পাগল মানুষগুলোর বহু ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী এই ছায়াবৃতা।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন রেড রোডের ঢলে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার গমকে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সে সময় ময়দানে ফুটবল-পাগলদের পদভারে ভূকম্পন ওঠে। লক্ষ মানুষ ঘেরা অথবা খোলা মাঠে ফোর্টের ঢালে উত্তেজনায় গমগমিয়ে ওঠে, প্রিয়দলের সাফল্যে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সঙ্গী দুঃখগুলিকে কিছু সময় ভুলে যায়, ঠিক সেই সময় ডাঁটিয়ে-ওঠা তরুণের নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ে ঘাসে, ঘোড়ার ক্ষুরে পিষ্ট হয় মনীষ, পিনাকীরা, গ্যালারি চাপা পড়ে কলিম।

অপরদিকে মাঠের মধ্যে কারও খেলোয়াড় জীবনের ইতি ঘটে, কারও বা অঙ্গহানি ঘটে। অবশ্য গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে খেলতে খেলতে মৃত্যু মাত্র দু'জনের ভাগ্যেই ঘটেছে। তবে অন্যান্য দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ।

সম্ভবত ১৯২৫ সালেই দুই ফুটবলারের জীবনদীপ নিভেছিল খেলতে খেলতে। এই শহীদরা হলেন, হাওড়া ইউনিয়নের রাজা ব্যানার্জি, আর দ্বিতীয়, স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতুল ব্যানার্জি। টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট ক্লাবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডিভিসন লিগ ম্যাচে একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সামনা-সামনি চার্জ হওয়ার পর রাজা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং মাঠেই মারা যান। প্রতুলের একই পরিস্থিতিতে একই খেলোয়াড়ের সঙ্গে চার্জ হয়ে মাঠেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। দুটি ক্ষেত্রেই হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

তারপর এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে কিন্তু পরবর্তী সময়ে বহু খেলোয়াড় মারাত্মক আহত হয়েছেন, যাদের সময়মত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে না পারার জন্য ক্ষতি হয়েছে।

ঘেরা মাঠে সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের লোক থাকে। তিন ঘেরা মাঠের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি অ্যাম্বুলেন্সও থাকে। আহত খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ স্বস্তি না আনতে পারলে তাতে করে হাসপাতালে পাঠানোও হয়। আর ঘেরা মাঠে বড় দলগুলির তো নিজস্ব ডাক্তার থাকেই।

কিন্তু খোলা মাঠে যারা খেলেন সেই ফুটবলারদের কি হবে! —একথা চিন্তা করে ১৯৭৭ থেকে আই এফ এ মাঠের একটি কেন্দ্রে কয়েকজন ডাক্তার রাখার ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রটি চলে ময়দানের পূর্বপ্রান্তে রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের তাঁবুতে। শেঠ সুখলাল কারনানী (পি জি) হাসপাতালের ডাক্তাররা এখানে বসেন।

চলতি মরশুমে আরও একটি নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে পশ্চিম দিকে পুলিস এ সি তাঁবুতে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কিছু ডাক্তার এখানে বসবে কথা ছিল। ৭ মে লিগ ফুটবল শুরু হয়েছে, কিন্তু ২৮ মে পর্যন্ত কেউ বসেননি। অবশ্য লিগ শুরুর আগেই আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষ সার্কুলার দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিস তাঁবুতে দ্বিতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রটি চালু হয়েছে। পুলিস ক্লাবের কর্মকর্তারাও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার জন্য আই এফ এ-র চিঠি পেয়েছে।

সি আর এ তাঁবুতে পি জি-র দু'জন করে ডাক্তার রোজ বিকেলে সাড়ে চারটা থেকে ৬টা পর্যন্ত বসেন। মোট ১৪ জনের প্যানেল। এখানে এখন দৈনিক গড়ে দু'তিনজন করে আহত আসে, পরে এর সংখ্যা বাড়বে। খুব সিরিয়স কেস হলে এরা পি জি-তে পাঠিয়ে দেন। শুনলে অবাক হতে হয় এই দেড় ঘণ্টা বসা ও চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তাররা এক কাপ চা-ও পান না, তবে ট্যাক্সিভাড়া (যাতায়াত) হিসেবে পাঁচ টাকা ভাতা পান।

আশা করা যাচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় কেন্দ্রটিও চালু হয়ে যাবে। এর ফলে নিশ্চিতভাবেই আহত খেলোয়াড়রা প্রাথমিক উপকৃত হবেন। তবে খোলা মাঠের খেলোয়াড়দের কথা মনে রেখে, এই দ্বিতীয় কেন্দ্রটি দ্রুত চালু করা এবং দুটি কেন্দ্রেই যাতে সুষ্ঠু পরিচালনা থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখার দিকে আই এফ এ নজর দিক। খেলার মাঠে আহত দর্শকরাও যাতে এই চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে নজর দেয়ারও প্রয়োজন আছে।

চিকিৎসক সম্পর্কিত আই এফ এ-র এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখন সব থেকে বড় প্রয়োজন, কাছাকাছি দু'তিনটি মাঠের জন্য বা সম্ভব হলে প্রত্যেক মাঠে নিদেনপক্ষে একটি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা রাখা। মাঠের পাশে ক্লাব টেন্টগুলিতে তা রাখা যেতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং-এর নিজস্ব ডাক্তার খেলার দিন মাঠে ফেনসিং-এর মধ্যেই থাকেন। কিন্তু এরিয়ান, জর্জ টেলিগ্রাফ ইত্যাদি মাঝারি টিমগুলিও ডাক্তার রাখে না। ছোট দলগুলি তো ষোল জনের টিফিন জোটাতেই গলদঘর্ম—আবার ডাক্তার!

আর এই দুর্মূল্যের বাজারে ডাক্তারদের ফ্রি-সার্ভিসের কথা চিন্তা করে ভাতার অঙ্কটাও বাড়ানো উচিত। নিতান্ত সমাজের প্রতি এই ডাক্তাররা দায়িত্ববান, আর একটা নয়া শুভ উদ্যমকে উৎসাহিত করতে ডাক্তাররা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন। কিন্তু আই এফ এর তো টাকার অভাব নেই। আর সৌজন্যবোধ বলেও একটা কথা আছে!

স্টেডিয়াম চিন্তা

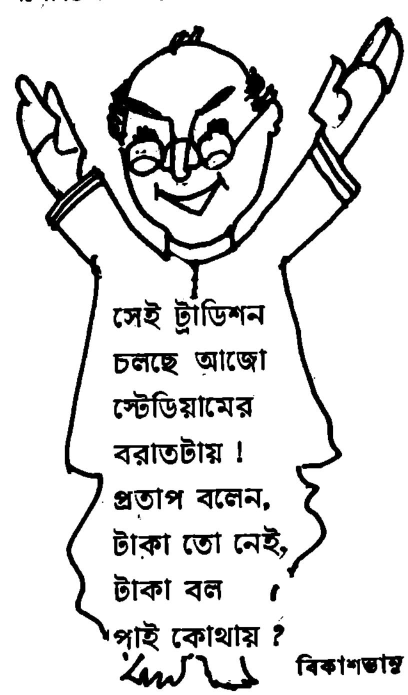
সেকাল/একাল

খেলার আসর, ২-৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯—কলকাতা খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র। ভাবতেও লজ্জা লাগে স্বাধীনতা পাবার একত্রিশ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গে আজও বড় স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি।

সোনার বাংলা, মে, ১৯২৩—ওয়েম্বলি (ইংল্যাণ্ড) পার্কের মত বড় জায়গা আমাদের এখানে দরকার নেই। তবে এতদিন পর কলকাতায় যখন একটা স্টেডিয়াম হবার কথা পাকাপাকি কথা হচ্ছে, তখন আশাকরি কর্তারা [কয়েক] হাজার জায়গা অন্তত যেন করেন, একটু বেশী হলেই কিন্তু ভাল।

★

হিন্দুস্থান, ২৫ মে, ১৯২৩—খেলা দেখার ভিড় যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে আর কয়েক বছরের মধ্যে খেলা দেখা অসম্ভব হইবে। গড়ের মাঠে জমি দিতে সরকারের আপত্তি হইলে সহর হইতে কিছু দূরে (বেশী দূরে না হয়) জমি লইয়া বাঁধা গ্যালারির বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।





ডিস্টেম্পারের রাজা

ট্র্যাক্টর

সিন্থেটিক ওয়াশেবল্ ডিস্টেম্পার

১) জামাকাপড়ে দেয়ালের পেন্ট লাগে না।
২) দেয়ালের ময়লা ভিজে কাপড়ে মুছলেই উঠে যায়।
৩) ৩/৪ বছর টেঁকে, প্রতিবছর পেন্ট করার খরচ বাঁচে।

এশিয়ান পেন্টস্

এর নামেই গ্যারান্টি

Adroit-1744 BEN

হিমানীশ গোস্বামী ঃ আন্তর্জাতিক দাবা থেমে নেই। দাবার অগ্রগতি হয়েই চলেছে। প্রত্যেক দেশ চেষ্টা করছে কিভাবে এই খেলায় আরও উন্নতি করা যায়, আরও এগিয়ে থাকা যায়। এই চেষ্টা চলেছে ব্যক্তিগতভাবে যেমন, তেমনি নানা সংস্থাও দাবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। ফিশারের পর থেকে দাবায় টাকার প্রশ্নটি খুবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ফিশারের বক্তব্য ছিল একজন বক্সার যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় তখন তার ভাগ্যে জোটে কোটি কোটি টাকা। অথচ দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বেলায় যেন করুণা করে কিছু ছিটেফোঁটা দেওয়া হয়। অতএব দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যিনি হবেন তাকেও পুরস্কৃত করতে হবে অনেক টাকা দিয়েই। তার দাবি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছিল। রিকইয়াভিক-এ ১৯৭২ সালের দাবার খেতাবী লড়াইয়ে ফিশার দাবি করেছিলেন, যতদিন খেলা চলবে ততদিন তার জন্য একটি নতুন মারসিডিজ বেনজ গাড়ি সব সময়ের জন্য মোতায়েন রাখতে হবে। এছাড়া, এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কারের টাকার প্রাপ্য ভাগ ছাড়াও যিনি জিতবেন তাকে টিকিট বিক্রির টাকার শতকরা ৩০ ভাগ দিতে হবে। এছাড়াও তিনি আরও অনেক রকম দাবি তুলেছিলেন, সেগুলর অনেকটাই কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন, আবার বেশ কিছু মেনে নিতে পারেননি। তবে আর্থিক দিক সম্পর্কে ফিশার যে খুবই সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওই সময়ে অনেকে ভেবেছিলেন ফিশারের মত অর্থলোলুপ ব্যক্তি দাবা জগতের পক্ষে কলঙ্ক, কেননা দাবা হচ্ছে বুদ্ধির লড়াই—ওর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক টেনে আনা ঠিক নয়। কিন্তু আজকালকার পৃথিবীর ধারাই বদলে যাচ্ছে। আজকাল যাতে টাকা নেই তাতে কারুরই যেন উৎসাহ নেই।

অর্থ নিশ্চয়ই চমৎকার ব্যাপার, আর যত বেশী তা পাওয়া যাবে ততই ভাল।

কিস্তিমাত

ইংরেজিতে বলে, দি মোর দি মেরিয়ার। মহম্মদ আলির কি কম টাকা? কিন্তু এখনও টাকার দিকে তার নজর বেশ ভালই। দাবা-খেলোয়াড়রা যুগ যুগ ধরে নিজেদের বঞ্চিত করে খেলেই চলেছেন। মনে পড়ে স্টাই-নিৎসের কথা। সারা জীবন কত সামান্য পেয়েছেন, আর কী অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন। ১৮৮৩ সালে ইউরোপে টাকার মুখ দেখতে না পেয়ে তিনি চললেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি ভেবেছিলেন ওই সোনার দেশে গেলেই বুঝি তার আর্থিক সঙ্কট কেটে যাবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, ওই দেশেও তাকে বেঁচে থাকতে বেশ কষ্টই হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে অর্থের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল।

আবার মনে পড়ছে শ্লেখটার-এর কথা। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৯১৮ সালের ২ মার্চ তার মৃত্যু হয়। এই বিখ্যাত খেলোয়াড়ের মৃত্যুর কারণ: অনাহার। অত্যন্ত গর্বিত এই মানুষটি অনাহারে থেকেও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব কারুর কাছ থেকে একটি পয়সা সাহায্য ভিক্ষা করেননি। তিনি নীরবে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। আজকের দিনে এমন ঘটনা ঘটতেই পারত না। প্রায় অনাহারে মৃত্যু হল সুলতান খানেরও, ১৯৬৬ সালে, কিন্তু পাকিস্তানকে সেজন্য ভবিষ্যতে লজ্জিত থাকতে হবে। আমার মনে হয় সুলতান খান ভারতে থাকলে তাকে হয়ত অপুষ্টিতে মরতে হত না। সুলতান খান কেন রুবিনস্টাইনের মত হঠাৎ খেলা ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘদিন ছিলেন সেটাও রহস্য রয়ে গেল। এ তথ্য কেউ জানেন কি?

যা বলছিলাম—দাবার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক। আজকাল দু'একটা প্রতিযোগিতায় একশো, দুশো টাকা এদেশেও কোন কোন টুর্নামেন্টে খেলে প্রথম দ্বিতীয় হলে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশ, কিংবা আরও বেশী পাওয়া যায়। কলকাতার অফিস লিগ খেলাও হচ্ছে তাতে অবশ্য তেমন টাকা পাওয়া যায় না। তবে আস্তে আস্তে দাবা খেলায় কিছু কিছু টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ। আন্তর্জাতিক খেলায় তো টাকার ছড়াছড়ি। তবে সেখানে প্রতিযোগিতাও প্রবল। কেউ কেবল দাবা খেলে ভালভাবে সংসার চালানোর কথা এদেশে ভাবতেও পারেন না। তবে দাবা খেলে একটা কিছু করতে পারলে চাকুরি পেতে সুবিধে হয়। অর্থাৎ, দাবা খেলায় পরোক্ষ একটা সুবিধে হয়। ভারতে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে খেলার জন্য দাবা খেলোয়াড়দের অফিস থেকে রীতিমত সাহায্যই করা হয়। যেমন ভেল্-এ, যেমন এল আই সি-তে, যেমন কলকাতা কর্পোরেশনে।

কিন্তু আসল টাকা রয়েছে বিদেশে! সাহিত্যে যেমন নানারকম পুরস্কার রয়েছে বিদেশে, তেমনি দাবাতেও রয়েছে। গতবারে কারপভ-করশনয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় কারপভ জিতেছিলেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসেবে ত্রিশ লক্ষ টাকারও বেশী। এছাড়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট 'বেনিফিট' তো আছেই সেগুলোরও অর্থ মূল্য বড় কম নয়।

সম্প্রতি আবার জবর একটা খবর পাওয়া গেছে। এটাও টাকা সংক্রান্ত। এবারে একটি মাত্র গেম খেলা হবে কারপভ এবং মার্কিন চ্যাম্পিয়ন ওয়াল্টার ব্রাউনের সঙ্গে। খেলা আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বরে। কারপভ কালো নিয়ে খেলবেন। এই একটি গেমে কারপভ হারলে ব্রাউন পাবেন ৫০ হাজার ডলার। অর্থাৎ, আমাদের টাকার হিসেবে ৪ লক্ষ টাকারও বেশী। আর ব্রাউন হারলে কারপভ পাবেন ওই একই পরিমাণ! ড্র হলে অবশ্য কেউই কিছু পাবেন না। খেলাটি খুবই জমাট হবে সন্দেহ নেই। চার লক্ষ টাকা শুনলেই তো গা কেমন ছমছম করে ওঠে। একটা কাঠের মূর্তিকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে কয়েক ঘণ্টায় এত টাকা পাওয়ার কথা স্টাইনিৎস, শ্লেখটার, সুলতান খান কখনও কি ভাবতে পারতেন তাদের জীবনে? আজকালও কি এই পরিমাণ খুবই আশ্চর্যজনক নয়?

ব্রাউন খেলেন কেমন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবায় এখন খুব একটা দুর্বল দেশ নয়। ওদেশে বহু গ্র্যাণ্ডমাস্টার রয়েছেন। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইনি শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত, তবে ইনি অধ্যাপক এলো-র হিসেব মত ২৫৪০ মার্কার মানুষ, আর কারপভ-এর মার্কা হল ২৭০৫। অতএব আমরা তো বলতে বাধ্য কারপভই জিতবেন। কিন্তু দাবাও ক্রিকেটের মত অনিশ্চিত হতে পারে। একটা সামান্য ভুল হলেই যেখানে সমস্ত গেমটিরই বিসর্জন হয়ে যায় সেখানে এ খেলার ফলাফল আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না।

ধাঁধা: প্রচণ্ড গরমে ধাঁধার ছক তৈরি করা যাচ্ছে না! অর্থাৎ কিনা ঘেমে যাচ্ছি। পরে এক সঙ্গে দুটো করে দিয়ে পূরণ করার ইচ্ছে রইল।

ও টি নার্স, দুই সন্তানের মা—নেশা রাইফেল স্যুটিং

অশোক চট্টোপাধ্যায়ঃ স্যুটারদের সম্বন্ধে আগে একটা লেখায় উল্লেখ করা হয়েছিল সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েদের শুধুমাত্র আগ্রহটুকু সম্বল করে স্যুটিং রেঞ্জে যাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা যে বেঠিক সে কথা এখনো বলছি না, সব নিয়মেরই যে ব্যতিক্রম থাকে সেটা স্বপ্না সান্যালকে দেখে বোঝা যায়।

বি আর সিং হাসপাতালের ও টি নার্স। সপ্তাহে ছ'দিন একটানা কঠোর পরিশ্রম। ডিউটি আওয়ার্সের বাইরেও কাজে ডাক পড়তে পারে। নাইট ডিউটি খুব সাধারণ ঘটনা। এ ছাড়াও সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম আছে। দুটি শিশু সন্তানের দায়িত্ব কম নয়। এর মধ্যেও স্যুটিং-এর নেশাটা বজায় রেখেছেন।

হাওড়া স্ট্যাণ্ড রোডের আবাস থেকে রাইফেল, সাজ-সরঞ্জাম ভরা একটা ব্যাগ নিয়ে দু'বার বাস বদলে সেই বেলগাছিয়ার নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল রেঞ্জে যাওয়ার জন্য আলাদা মনোবল আর সাহস থাকা প্রয়োজন। রাইফেল এমনি একটা জিনিস, যার দ্রব্য মূল্য বাদ দিলেও সমাজ বিরোধীদের কাছে তার একটা আলাদা আকর্ষণ থাকতেই পারে। আর শহর কলকাতায় যে চুরি ছিনতাই হয় না, এমন গ্যারান্টিই বা কে দেবে? স্বপ্না বললেন, 'ভয় পেলেই ভয়, বিপদ এলে কি করব জানি না, তবে অঘটন যতক্ষণ না ঘটছে, ততক্ষণ সে বিষয়ে ভীত হবার কারণ কি?'

ছেলেবেলায় জ্যাঠামশাইয়ের কাছে রাইফেল দেখেছিলেন। জ্যাঠামশাই পুলিসে কাজ করতেন, সে সূত্রে তার একটা রাইফেল ছিল। ওই অস্ত্রটা দেখে সমীহ জাগত, কিন্তু নিজে যে কখনো হাতে তুলে নেবেন ভাবেননি।

জ্যাঠামশাই তখন আসানসোলে পোস্টেড। স্বপ্নাও সেখানে থাকেন। সেটা '৬২ সালের ঘটনা। ওখানে তখন নতুন রাইফেল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, সদস্য তালিকায় কয়েকজন মেয়েকে পাওয়া গেলে ভাল হত। কার্তিক বসুর আগ্রহে কয়েকটি মেয়ে ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে স্বপ্না একজন। ছ'মাস প্র্যাকটিসের পরই দিল্লি ন্যাশনালে গিয়েছিলেন। '২২ ওপেন সাইট-এ (১৭৮/২০০) মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। পরের বছর কলকাতা ন্যাশনালে একই বিভাগে আবার চ্যাম্পিয়ন (৩৩৫/৪০০)। তবে স্বপ্না



স্বপ্না সান্যাল

সান্যালের কেরিয়ারে সাফল্যের পরিমাণ যে অজস্র তা নয়। তবু অন্য কারণে স্বপ্না সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'গুলির বড় দাম। বিদেশী গুলি একটাই তিন থেকে সাড়ে তিন টাকায় কিনতে হয়। আর প্রতিযোগিতায় যেতে হলে বিদেশী কার্টিজে প্র্যাকটিস করাটা একান্ত দরকার। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়তি কিছু কিনতে গেলেই মনে পড়ে, এ টাকাটা বাঁচাতে পারলে তা দিয়ে আরো কিছু গুলি কেনা যেত।' এভাবে কৃচ্ছ সাধন করে একজন স্যুটার কতদূর এগোতে পারেন সেটাই প্রশ্ন।

স্যুটিং জ্যাকেট বলতে যা বোঝায়, সেই উচ্চ মূল্যের জিনিসটি স্বপ্নার নাগালের বাইরে। তাই দর্জিকে দিয়ে ত্রিশ টাকা খরচ করে একটা জ্যাকেট বানিয়েছেন। মুচিকে দিয়ে তাতে প্রয়োজন মত চামড়া টামড়া লাগিয়ে মোটামুটি একটা খাড়া করেছেন।

'দেখতে সুন্দর হয়নি, বা সত্যিকারের কয়েক হাজার টাকা দামের বিদেশী স্যুটিং জ্যাকেটের মত কাজও হয় না।'......তবু একেবারে মামা না থাকার চেয়ে কানা মামা থাকা ভাল।

নতুন একটা রাইফেলের খরচ অনেক। পুরোন মডেলের একটা রাইফেল হাজার আড়াই টাকায় কিনেছিলেন। কিন্তু সে রাইফেলের শতেক দোষ। শ্রীমতী সান্যালের স্যুটার জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা তার স্বামী তখন সেটা নিয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক পেশায় এঞ্জিনিয়র, কাজ করেন সরকারী টাঁকশালে। তিনিই রাইফেলটা নিয়ে পড়লেন। অনভ্যস্ত হাত, তবু বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক অদল বদল করলেন। তাতেই ছুঁড়ছেন, তবু যদি একটা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ভাল রাইফেল পাওয়া যেত, স্বপ্নার ধারণা একাধিক সোনার মেডেল পাওয়াটা তখন খুব একটা অসম্ভব হয়তো হত না।

স্বপ্না সান্যালের স্যুটিং '৬৪ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ ছিল। তারপর '৭০ সালে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ভর্তি হন। ওই ক্লাব উঠে যাওয়ায় এখন নর্থ ক্যালকাটা ক্লাবের সদস্য। স্যুটিং জীবনে সাহায্য পেয়েছেন গীতা রায়, হরিহর ব্যানার্জি ও হরিচরণ সাউ-এর। হাসপাতালের দুই এম এস ডাঃ কুণ্ডু ও ডাঃ মেরহোত্রা নানারকম ভাবে সাহায্য করেন।

শ্রীমতী সান্যাল এককালে পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ত্রিশূল অভিযানে অংশ নেবার জন্য ডাক এসেছিল, কিন্তু যাওয়া হয়নি।

অসুবিধে আছে অনেক। ন্যাশনালে যাওয়ার খরচ জোগাতেই হিমসিম খেতে হয়, তার ওপর আবার যদি সিলেকশন ট্রায়ালে যাওয়ার ডাক পড়ে—যাওয়া মানে সঙ্গী হিসাবে স্বামী ও দুই শিশুকে সঙ্গে রাখতেই হয়, অত খরচ পোষানো সব সময় হয়ে ওঠে না। 'তবু দেখে যাচ্ছি, কতদূর কি পারি। স্যুটিং ছাড়ব না। বাড়িতে ঘরের মধ্যে এয়ার রাইফেল প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করেছি। ক্লাবে যাওয়ার ঝক্কি ঝামেলা আর খরচ খরচার কথা তো আগেই বলেছি।'

এত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্না সান্যাল যদি এগিয়ে যেতে পারেন, তাহলে শুধু তার নয়, উপকারটা বাংলার স্যুটিং-এরই হবে। ইচ্ছে আর লেগে থাকার ক্ষমতা থাকলে যে কোন সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েদেরও এপথে এগিয়ে আসা সম্ভব সেটা উদাহরণ হয়ে থাকবে।

নুরুল আমিন কি সর্বভারতীয় কেউ নন ?

নুরুল আমিন মহাশয়ের যে কার্টুন চিত্র (লাহিড়ী অঙ্কিত) গত ৪ মে-র খেলার আসরে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রতিবাদে আসামের (গৌহাটির) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় উক্ত কার্টুনটি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার শিরোনাম 'কলকাতার কাকতত অসমর বিরুদ্ধে অপমান সূচক কার্টুন' অর্থাৎ কলকাতার কাগজে আসামের বিরুদ্ধে অপমান সূচক কার্টুন। এ সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রশ্ন ঃ

(১) উক্ত কার্টুন দ্বারা কিভাবে আসামের অপমান করা হল ? 'ফেডারেশন কাপ ফুটবল' কি কেবল আসামের একার সম্পত্তি, না একটি সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা?

(২) নুরুল আমিন আসামের লোক, একথা সত্যি, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি সেহেতু উক্ত কার্টুনটির ব্যাপারে বিশেষ কোন রাজ্যের প্রতিবাদ করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য, অতীতে অর্থাৎ কংগ্রেস আমলে আসামের যে দুইজন প্রথম সারির সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতার কার্টুন চিত্র সারা ভারতের পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হত, তখন কেন অনুরূপ প্রতিবাদ তোলা হত না ?

(৩) প্রতিবাদকারী সাপ্তাহিকটিই কি নিরপেক্ষ ? এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ কলকাতার তিন প্রধান এবার গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত 'ফেডারেশন কাপ ফুটবল' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করায় স্থানীয় ইংরাজী এবং অসমীয়া দৈনিক পত্রিকাগুলি, এমনকি গৌহাটি 'নেহেরু স্টেডিয়াম' থেকে স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত উক্ত প্রতিযোগিতার ধারাবিবরণীতে যেভাবে 'রোভার্স', 'স্টাফোর্ড' ও 'নাগজী ট্রফি' ইত্যাদি খেলার উল্লেখ করে উক্ত তিন প্রধানের নিন্দা করেছে-সে ব্যাপারেতো কোনরূপ প্রতিবাদ বা সমালোচনা উক্ত সাপ্তাহিকটি করেনি!

(৪) গৌহাটি তথা আসামে খেলার ব্যাপারে এখন কলকাতার ফুটবল দলগুলির উভয় সংকট, খেললেও ঝগড়া-বিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা , না খেললেও বিরুদ্ধাচরণ।

(৫) একথা সর্বজনবিদিত যে খেলাধূলায় রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি লজ্জাজনক ঘটনার জন্য ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে। তথাপি কেন যে আসামের পত্রিকাগুলি প্রাদেশিকতা থেকে খেলাধূলাকে নিষ্কৃতি দিতে পারছে না, এইটাই আশ্চর্য।

বকোর (কামরূপ) জনৈক অধিবাসী।

সেরা দর্শককে পুরস্কার দিন

দর্শকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি:

২১ মে থেকে কলকাতার তিন প্রধান মাঠে নেমেছেন। খেলা খুব একটা উন্নতমানের না হওয়ায় দর্শকদের আচরণ মাঠে উপস্থিত সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে। দর্শকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশী ব্যবস্থা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা হচ্ছে। তবে একটা কথা ঠিক, সবসময় সব কাজ 'লাঠি' দিয়ে করা যায় না। আমার প্রস্তাব—পুলিশী ব্যবস্থা শিথিল করে একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবস্থার মোকাবিলা করা হোক। প্রতি বৎসরই তো বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়। এবার থেকে 'বর্ষ শ্রেষ্ঠ দর্শকগোষ্ঠী' নির্বাচন করলে কেমন হয় ? মাঠের প্রত্যেক প্রান্তে দর্শকগোষ্ঠীকে অন্তত দুই ভাগে বিভক্ত করে, প্রাক্তন ফুটবলারের নামানুসারে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নামকরণ করা হোক। তার মধ্যে যে গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও শান্তভাবে মাঠে অবস্থান করবেন, তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে কমপক্ষে দশ জনকে নির্বাচন করা হোক। তাদের পুরস্কার হবে, কলকাতার ফুটবল তারকার সঙ্গে একটি সন্ধ্যায় চা পানের আমন্ত্রণ। সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলার দাদাদেরও অনুরোধ, আপনারা মাঠের মধ্যে এমন আচরণ করবেন না যাতে দর্শকগোষ্ঠী উত্তেজিত হন এবং তাতে যেন তাদের চা পানের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত না করেন। তা হলেই আর পুলিশের দরকার হবে না এবং তাতে সম্পূর্ণ না হোক আংশিক স্বস্তি মাঠে ফিরে আসবে। সুখের চেয়ে স্বস্তিই ভালো। দর্শকগোষ্ঠী সুখে না হোক অন্তত স্বস্তিতে খেলা দেখতে পাবেন।

ওয়াং লিং চেন, চন্দননগর।

(২)

আমাদের দেশেও এই অশান্তির ছোঁয়া লেগেছে। দর্শকরা আজ সামান্য কারণেই খেলা পরিচালককে গালি দিচ্ছেন, মাঠে হামলা করছেন। সমর্থক দল হেরে গেলে বিজয়ীদলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন না জানিয়ে, তাদের উপর হামলা করছেন। মাঠে দর্শক হামলায় অনেক খেলাকেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। মাঠে খেলোয়াড়দের অন্যায় আচরণের জন্য লাল কার্ড দেখানোর ঘটনাও বাড়ছে। আগের বছরের ফেডারেশন কাপ, আই এফ এর বিভিন্ন খেলা এবং এইবারের বেটন কাপের দুঃখজনক ঘটনাগুলির আর পুনরাবৃত্তি হবে না, এই আশাই করছি।

বর্তমানে সমস্ত দর্শক, খেলোয়াড় তথা ক্রীড়া-প্রেমিকদের এই সমস্ত অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। খেলার কর্মকর্তাদেরও এই সমস্ত ঘটনার দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আমাদের সকলকে এক হয়ে খেলাধূলার ক্ষেত্রে এই আবর্জনাকে দুর করতে হবে এবং এর মহান ঐতিহ্য ও পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

গৌতম পাঠক, ভবানীপুর, পুরুলিয়া।

(৩)

২৫ মে বেতারে ধারাভাষ্য শোনার সময় গোলকিপার যখন আহত হলেন, তখন বেতারে ভেসে এল এক অচেনা দর্শকের কণ্ঠস্বরের অশ্রাব্য কয়েকটি শব্দ। যিনি কথাটা বলেছেন তিনি মনে করলেন আমার কথা বেতারে শোনা গেল, কত বাহাদুরির কাজ করলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই ? তিনি হয়ত জানেন না কত মা, ভাই, বোন বেতার মারফৎ খেলা শুনছে। মা বোনেরা ওই ব্যক্তিদের জন্য মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে পারেন না, তারা কি রেডিও থেকেও মা বোনেদের দূরে সরাতে চান ? মোহনবাগান ও মহমেডানের তুলনায় ইস্টবেঙ্গলের দর্শকদের খারাপ ভাষাযুক্ত জোরালো কণ্ঠস্বর বেতারে বেশী শোনা যায়।

আসুন না, আমরা সকলে একসঙ্গে ওইসব খারাপ দর্শকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

সরিফ আমেদ, মগরা, রাধাকান্তপুর, বর্ধমান।

(৪)

কলকাতা মাঠের গ্যালারিগুলো যে অপরিচ্ছন্ন থাকে তা খেলার দর্শক সাধারণের সবারই জানা। বিশেষ করে বর্ষাকালে গ্যালারির নীচে যে জল জমে থাকে তা নিষ্কাশন করার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। এই জল জমে থাকার দরুন যাতায়াতের পথে দর্শকদের মাঝে মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এছাড়া বসবার জায়গাতে পুরনো কাগজ, খাওয়ার ঠোঙা বা বাদামের খোসা ফেলে অযথা নোংরা করা হয়। তাই কর্তৃপক্ষ তথা দর্শকদের কাছে অনুরোধ জানাই যেন গ্যালারি এবং তার আসপাশ পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা হয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে যাতে খেলার আনন্দ আরও বেশী করে উপভোগ করা যায়। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে তাই বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রহ্লাদ ঘোষ, কলকাতা-২৯

পাঠকের কলমে

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থক মৈত্রী

বাঙলার অগণিত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত এবং ফুটবল প্রেমিকদের হৃদয় বিজড়িত কলকাতা ফুটবল লিগের সূচনা হয়ে গিয়েছে। এখন বাঙলার ফুটবল দরদীদের চোখ নিবদ্ধ কলকাতা ময়দানের দিকে। এই খেলাকে কেন্দ্র করেই বাঙলা দু'ভাগে বিভক্ত। মহমেডানেরও সমর্থক আছেন কিন্তু আসল লড়াই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রতি বৎসর দেখা যাচ্ছে এই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে কেন্দ্র করেই বাঙলার ফুটবল-দরদীদের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করছে। শুধু কি তাই! এই খেলার জের শেষ পর্যন্ত বর্তায় সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার উপর। আইন-শৃঙ্খলার হয় অবনতি। সরকারকে করি আমরা বিব্রত আর আমাদের এই কীর্তি কাহিনী খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপিয়ে আমাদের অর্থাৎ বাঙলার ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে এনে দিয়েছে বৈষম্য। কিন্তু আমরা যদি পুরনো বিবাদ ভুলে গিয়ে পরাজিত দলের সমর্থকদের কটুক্তি না করে, উপহাস না করে তাদেরকে নিয়েই বিজয় উৎসবে মেতে উঠি তাহলে খুব সুন্দর হয়। আনন্দের মাত্রাও বজায় থাকে এবং আইন-শৃঙ্খলাও অটুট থাকে। মনে পড়ে ১ বৎসর আগে শিল্ড ফাইনালের কথা। সেদিন যুগ্মজয়ী হয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা গলা জড়াজড়ি করে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সমর্থকরা নিশ্চয় এদিন বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন আর সেদিন রেডিও মারফৎ এই খবর শুনে অলক্ষ্যে আমার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নির্গত হয়েছিলো। তাই আমার অনুরোধ, আসুন আমরা পুরানো বিবাদ ভুলে গিয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থক মৈত্রী গড়ে তুলি। অন্যদের বুঝিয়ে দিতে হবে, বাঙলার ফুটবল সমর্থকরা সত্যিই সমঝদার। তাই আমার মনে হয় এই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থক মৈত্রী বাঙলার ফুটবল-দরদীদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে।

অসিত মুখার্জি, বোলপুর।



কেন বাংলা নয়

১ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত পুরস্কার প্রাপ্ত অভিজিৎ সরকারের পত্রখানা পড়ে প্রতিবাদ না করে পারছি না। অভিজিৎ সরকারের এই অযৌক্তিক মন্তব্যে সত্যিই অবাক হয়েছি! অভিজিৎবাবুকে আমার প্রশ্ন, কোন যুক্তিতে তিনি কেরালা, পাঞ্জাব ইরান থেকে আসা খেলোয়াড়দের জন্য জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার নামই বদলে দিতে চাইলেন। ইতিপূর্বে কি আর কোন বাইরের খেলোয়াড় বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেননি ? লেখক কি আমেদ খান, মেওয়ালাল, ভেঙ্কটেশ, থঙ্গরাজ, জার্নেল সিং, হাবিবদের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। পাঞ্জাব, ইরান, কেরালা থেকে আসা খেলোয়াড়দের গায়ে রাজ্যের ছাপ মারা আছে না কি ? ওরা কি আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করে বাংলার খেলোয়াড় হননি ? অভিজিৎবাবু এভাবে বাংলার নাম বদলে দিতে গিয়ে আঞ্চলিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। আর নামই যখন বদলে দিতে গেলেন তখন নাইজেরিয়া বা তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, আসাম, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যের নাম যুক্ত করলেন না কেন ?

অভিজিৎবাবু মনে রাখবেন, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আইন অনুসারে ওরা এখন বাংলার খেলোয়াড়। তাই অনুরোধ, ওদের মধ্যে আঞ্চলিকতার বিভেদ ঢুকিয়ে দেবেন না! বাংলায় বসবাসকারীরা সবাই বাঙালী নন।

দেবাশিস পাল, অনিমেষ গোস্বামী,
রামনগর রোড, আগরতলা।

ভাল খেলে না কেন ?

এমন কতকগুলো ব্যাপার থাকে যেগুলো আমরা বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেকেই বুঝি।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে খেই হারিয়ে সবকিছু গোলমাল করে ফেলি। এমনই একটি প্রশ্ন 'বড়দলের নামী-দামী খেলোয়াড়রা ভালো খেলল না কেন ?' আবার অন্যদিকে দেখি নামী-দামী খেলোয়াড়রা প্রায়ই ভয় করেন তাদের বিপুল সমর্থকদের। যাদের কাছে পান থেকে চুন খসলেই লঘু পাপে গুরুদণ্ড পাবার সম্ভাবনা। একটু হিসাব করা যাক। কলকাতার লিগে ২২টি ম্যাচ, শিল্ডে ৫টি, রোভার্স, ডুরাণ্ড মিলিয়ে প্রায় ১২টি ম্যাচ। তারপর আছে অফিসের প্রায় ১০টি খেলা। সিজন শুরুর আগে প্রায় গোটা পাঁচেক প্রদর্শনী ম্যাচ। তারপর নাগজী ট্রফি বা ওই ধরনের কোন প্রতিযোগিতায় ক্লাব অংশ নিলে তাতেও ৫/৬টি ম্যাচ। আবার জাতীয় ফুটবলের ৬টি খেলা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একজন ভালো খেলোয়াড়কে বছরে প্রায় ৬৬টি ম্যাচ খেলতে হয়। আবার এশিয়ান গেমস বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক খেলা থাকলে তো সত্তর ছাড়িয়ে যাবে। সঙ্গে আছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রোদে ৩ ঘণ্টা কঠোর অনুশীলন। প্রতিযোগিতাগুলো এমনভাবে হয় তাতে এই সব খেলোয়াড়রা বছরে এক মাসও বিশ্রাম পান কিনা সন্দেহ।

সুতরাং এরই মাঝে প্রত্যেকটি খেলা খেলতে হয় এবং সর্বদাই ভালো খেলতেই হবে এই ধরনের একটা মানসিকতায় ভুগতে হয় প্রায় প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই। আমরা কিন্তু অত শত বুঝেও যেন বুঝি না। ভালো না খেললেই তিরস্কার প্রাপ্য। যন্ত্রও বিকল হয়। কিন্তু ভগবান সৃষ্ট মানুষ-এর ব্যতিক্রম হবে কি করে। আমার ধারণা তিরস্কার না করে ব্যাপারটা একটু সহানুভূতির চোখে দেখলে হয়তো আমরা এতটা নিরাশ হব না।

নীলমণি সরকার, চন্দ্রমণ্ডল লেন, কলকাতা।

এটা কি সত্যি ?

কসমস ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের প্রদর্শনী খেলাটি অনেকদিন হল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকা মারফৎ জেনেছিলাম যে, এই খেলাটি সম্পূর্ণ সিনেমার রিলের ন্যায় ফিল্ম করা হবে। যারা খেলাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে তারা তো ভাগ্যবান। আর যারা টেলিভিশনে দেখেছে তারাও দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে। কিন্তু যারা উক্ত দুটির কোনটিই পায় নি—তাদের কাছে সংবাদটি একটা শুভ দায়ক ও সান্ত্বনাদায়ক ছিল। কিন্তু অনেক দিন তো হয়ে গেল এখনও কেন যে এ সম্বন্ধে কোনও খবরই পাচ্ছিনা—সেটাই বুঝতে পারছি না। তাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখি—ফিল্ম কি সত্যিই তোলা' হয়েছিল নাকি সংবাদটি ছিল নিতান্তই ছেলে ভোলানো ?

সুবিনয় মুখার্জি, মৃত্যুঞ্জয়, অরিন্দম, স্বপন, রামু, রাজু, সুরেশ ও আরও অনেকে। শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

সাহায্য তহবিল

কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল খেলোয়াড়রা একটা সাহায্য তহবিল ও সংগঠন সংস্থা নিজেরা গড়ে তুলুন। এর ফলে অতীত দিনের অনেক দুঃস্থ খেলোয়াড় আর্থিক সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। বর্তমান খেলোয়াড়রা যারা আজ রাজনীতির শিকার হচ্ছেন, তারা উপকৃত হবেন নিজেদের গড়া সংগঠন সংস্থার মাধ্যমে। আমার মনে হয়, এটা করতে পারলে বর্ষীয়ান খেলোয়াড়দের প্রতি সমবেদনা জানানো হবে এবং ছোট বড় খেলোয়াড়রা যারা কর্তৃপক্ষের নেক-নজরে (!) পড়ছেন, তারা সংগঠন সংস্থার মাধ্যমে মনের জোর ও অন্যায়ের প্রতি রুখে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারবেন।

তপন মজুমদার, গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

আই এফ এ-র সিদ্ধান্ত ও এবারের লিগ

সাধুবাদ জানাই আই এফ এ-র এবারের লিগে ওঠা-নামার সিদ্ধান্তকে। চারটি করে প্রতিযোগী দলের নামা-ওঠার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ইতিমধ্যেই আমরা লিগের খেলাগুলোতে দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ডিভিশনের তথাকথিত ছোট দলগুলি লিগের প্রথম খেলা থেকেই মরিয়া হয়ে নেমেছে নিজ দলকে অবনমনের হাত থেকে রুখতে। নিজ ঘর রক্ষার এ প্রয়াস এনে দিয়েছে কলকাতা ফুটবলে প্রাণের ছোঁয়া।

অপরদিকে প্রচুর নামী দামী তারকা সমন্বিত তিন প্রধানও লিগ জয়ের নিশানা লক্ষ্য করে ছুটছে। এ বছরের প্রতিটি খেলা তাদের কাছেও এক একটি পরীক্ষা স্বরূপ। ছোট দলগুলির প্রতিরোধ ভেঙে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে বড় দলগুলিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে। আজ তাই তিন প্রধানের অতি বড় সমর্থকও বোধহয় নির্দ্বিধায় নিজ দলের পাঁচ, ছয় বা সাত গোলে জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে বসবেন না।

আই এফ এ-র সিদ্ধান্তে আরো একটা বড় উপকার হবে মনে হয়—সেটা হল, মাঠের বাইরের পয়েন্ট ভাগাভাগির খেলা বন্ধ হওয়া। কলকাতার ফুটবলকে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে এও এক মস্ত বড় লাভ বইকি।

সবশেষে দর্শকদের অনুরোধ করি, তারা যেন অযথা ইঁটপাটকেল ছোঁড়াছুড়ি না করেন। রেফারির দায়িত্ব যেমন সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করা, তেমনি প্রত্যেকটি দর্শকের কর্তব্য শৃঙ্খলার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে খেলাগুলো সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেওয়া।

মৃদুল ভট্টাচার্য, বিদ্যাভবন হোস্টেল,
শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

বাঁচার লড়াই

বড় দলগুলির বিরুদ্ধে ছোট দলগুলির খেলায় (আপাতত পাঁচটি খেলা শুনে) আমরা আনন্দিত। এ হচ্ছে ছোট দলগুলির বাঁচার লড়াই। পয়েন্ট অর্জনের লড়াই। কারণ এ বছর হতে দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম দিকের চারটি দল প্রথম ডিভিসনে আসবে এবং প্রথম ডিভিসনের শেষ দিকের চারটি দল পরের বছর যাবে দ্বিতীয় ডিভিসনে। কাজেই তাদের (প্রথম ডিভিসনের ছোট দলগুলির) প্রথম ডিভিসনে অস্তিত্ব রাখতে হলে পয়েন্ট সংগ্রহ করতেই হবে এবং তারা তা অর্জনের জন্য প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমি বাংলার ফুটবল কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে তাদের অনুরোধ করছি তারা যেন পরের বছর থেকে এই নিয়মের (প্রথম ডিভিসন থেকে চারটি দলকে নামানো এবং দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে চারটি দলকে উঠানোর) সঙ্গে সঙ্গে অন্তত প্রথম ডিভিসনের জন্য আরেকটি নিয়ম চালু করার চেষ্টা করেন।

নিয়মটি হচ্ছে—

প্রত্যেক দলকে কম করে তিন গোলে জয়লাভ করতে হবে এবং তিন গোলে জিতলেই তবে তারা পুরো পয়েন্ট পাবে। এক্ষেত্রে পুরো পয়েন্ট হবে তিন। যদি কোন দল তিন গোলের কমে জয়লাভ করে তবে সেই দল দুই এবং বিপক্ষ দল এক পয়েন্ট পাবে। যদি খেলা ড্র হয় তবে উভয় পক্ষই এক-এক পয়েন্ট পাবে। আমার মতে এই নিয়মটি চালু করতে পারলে প্রত্যেক দলই চেষ্টা করবে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে এবং গোল করতে। বিপক্ষ দল চেষ্টা করবে বড় দলগুলিকে গোল না করতে দিতে এবং একটি গোল হলেই তারা হতাশায় ভেঙে পড়বে না। ছোট দলগুলির গোলে একটি বা দুটি বল প্রবেশ করলেও যেহেতু তারা এক পয়েন্ট পাবে সেহেতু তারাও চেষ্টা করবে তাদের আটকাতে। এই নিয়মটি চালু হলে ছোট দলগুলি কিছু সুবিধা পাবে নিশ্চয়ই কিন্তু এতে খেলার মান অনেক উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে ভারত আবার ফুটবলে আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে।

স্বপন মুখার্জি, নয়াবাজার, ধানবাদ।

তুলসী দত্ত

'থাকতে জোটে না ভাত-কাপড়
মরলে পরে দান-সাগর।'



কথা কয়টি হঠাৎ সেদিন মনে পড়ল ফুটবল খেলোয়াড় তুলসী দত্তের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সংস্থা এবং ক্লাবের পক্ষ থেকে তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতির বহর দেখে। ভাবতে অবাক লাগে। মানুষ বেঁচে থাকতে একরকম এবং মরলে আর একরকম। যে নিরহংকারী মানুষটি অতীতে তার ক্রীড়া চাতুর্যের মাধ্যমে তাবৎ ফুটবল প্রেমীর মন কেড়ে নিয়েছিলেন, শেষ জীবনে দুঃসহ বিভিন্ন জ্বালা বুকে নিয়েই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হল। আর্থিক সাহায্য কি তার জীবিতাবস্থায় করা যেত না ? এতে কি তুলসী দত্ত শত কষ্টের মধ্যেও একটু স্বস্তি পেতেন না ? হয়তো যদি এই সাহায্যটি জীবিতাবস্থায় করা যেত, তবে তিনি শত কষ্টের মধ্যেও একটু স্বস্তি পেতেন।

শান্তিময় ব্যানার্জি।

শব্দ-জব্দ

'শব্দ-জব্দ' বিভাগটি সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখুন। আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। দুর্ভাগ্যবশত পড়াশুনা ছেড়েছি। শব্দ-জব্দ তৈরি করেও পাঠাতে পারছি না, ছাত্র নই বলে।

রঞ্জন মহাপাত্র, কাঁথি।

রাজ্য বক্সিং-এ রদবদল ?

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানলাম ইদানিং একদিন বি এ বি এফ-এর নূতন অফিসের পিয়ন মনোনয়ন হয়েছে। আইন বাঁচিয়ে একটু রদবদল করে, সেই পুরাতন গোষ্ঠীর 'এক বিশেষ জনের' হাতেই ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। কলকাতার এক প্রখ্যাত তরুণ ব্যবসায়ীকে সম্পাদক বানিয়ে তার কাঁধে বন্দুক রেখে পুরাতন উৎসাহীজনেরা নিশ্চিন্ত মনে গুলি চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই দলের নব সহ-সম্পাদক ইতিমধ্যে বেঙ্গল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি পুরাতন সংস্থাকে ভরাডুবি করে ছেড়েছেন। যদিও ওই মৃতপ্রায় সংস্থা সরকারী অর্থ সাহায্যে পুষ্ট। অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়াক্ষেত্রে আইন করে রাজনীতি ও সরকারী-বেসরকারী টাকার অপচয় বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। তবে সুখের কথা যে, বক্সিং-জনক পি এল রায় মহাশয়কে এতদিন পর এই সম্মান দেখান হয়েছে। কিন্তু রায় সাহেবের বয়স আশীর কিছু অধিক। তাই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিজস্ব মতামত এই নতুন গোষ্ঠীর উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

বলাই চন্দ্র দাস, কাশীপুর, কলকাতা-৪৩।

খেলার মাঠে সঙ্গী আছে
পটকা এবং কাঁসর,
তারই সাথে সবার হাতে
ঘুরছে 'খেলার আসর'।
গোলটা হলেই বাজতে থাকে
খুশির কাঁসর ঘন্টা,
'খেলার আসর' পড়তে পেলে
সজীব থাকে মনটা।

আবদুল হাফিজ,
২৭-বি, গার্ডনার লেন, কলকাতা-৭০০০১৪।



চিঠিপত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। মনে রাখবেন দু'পৃষ্ঠায় লেখা চিঠি ছাপান সম্ভব নাও হতে পারে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না, চিঠি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখবেন। গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কোন বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে' উল্লেখ করবেন। তা না হলে ওই চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না।

[সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার গিফট চেক পাবেন ধানবাদের স্বপন মুখার্জি]

বাংলাদেশে ফিলিপস টেনিস

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ

বাংলাদেশের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির বিশিষ্ট প্রস্তুতকারক 'ফিলিপস বাংলাদেশ লিমিটেড' ৪ বছর যাবৎ বিভিন্ন বিভাগে উন্মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে আসছেন। বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকেন। এবছর এ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সকলেই উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

টুর্নামেন্টের পুরুষ বিভাগের খেলাগুলো ছিল অনন্য। সেমিফাইনাল পর্যায়ে ভারতের প্রবীন সিং থাইল্যাণ্ডের আমেরিকান খেলোয়াড় ডন ফ্রেজারকে ৬—০, ৬—২ ও ৬—২ গেমে হারান। সুদেহী ও কড়া সার্ভিসের অধিকারী প্রবীন সিং অত্যন্ত সতর্কতা ও নিপুণতার সঙ্গে খেলে সেদিন খুব সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।

অপর সেমিফাইনালে থাইল্যাণ্ডের পিরিস বরোডিসার পরিমার্জিত টেনিস নৈপুণ্যের সামনে ভারতের স্নেহাংশু ভট্টাচার্য কোন সুবিধাই করতে পারেননি। স্নেহাংশু ২—৬, ০—৬ ও ১—৬ গেমে বরোডিসার কাছে পরাজিত হন।

ফাইনাল খেলার দিন বৃষ্টির দরুন মাঝপথে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন নির্ধারিত সময়েও মাঠের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় প্রবীন সিং ও বরোডিসাকে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। খেলা চলাকালীন সময়ে প্রথম সেটে এগিয়েছিলেন প্রবীন সিং ৬—৪ গেমে আর দ্বিতীয় সেটে এগিয়েছিলেন বরোডিসা ৪—৩ গেমে।

দ্বৈত বিভাগে ভারতের প্রবীন সিং ও স্নেহাংশু ৬—২, ৬—৪ ও ৬—০ সেটে থাইল্যাণ্ডের পিরিস বরোডিসা ও ডন ফ্রেজারকে হারিয়ে শিরোপা বিজয়ী হন।

জুনিয়র একক ফাইনালে এস ইফতিখার ৬—৩ ও ৬—০ সেটে মোরশেদকে হারিয়ে বিজয়ী হয়।

মিশ্র যুগ্ম ফাইনালে জ্যোতিষলাল চৌহান ও ইভা ব্রোনদিক ৬—৪ ও ৬—২ পয়েন্টে খালেদ ও নঈমা রহমানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেন।



ফিলিপস টেনিস ট্রফি

উন্মুক্ত ব্যাডমিণ্টন : বাংলাদেশ বিমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলাদেশ ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সহযোগিতায় সম্প্রতি প্রথমবারের মত সারা বাংলাদেশব্যাপী উন্মুক্ত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল ঢাকার জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। মোট ১৬টি দলের প্রায় ৬৫ জন খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ৫টি বিষয়ে। এদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা।

প্রচুর উত্তেজনা, সমর্থকদের উল্লাসের মধ্য দিয়ে এ প্রতিযোগিতা শেষ হল আর ফলে অনেক দু'দে খেলোয়াড় তাদের অবস্থান হারালেন এ প্রতিযোগিতায়। বাংলাদেশের বর্তমান এক নম্বর পেনু সেমিফাইনাল পর্যায়ে গেলেন হেরে। মহিলাদের মধ্যে এক নম্বর হারলেন দু নম্বরের কাছে শেষ খেলায়। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিন।

যারা এই উন্মুক্ত ব্যাডমিণ্টনে শিরোপা জিতলেন :

পুরুষ একক বিভাগে চূড়ান্ত খেলায় বাংলাদেশ বিমানের বাবুল মেট্রোপলিটন ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের জিলানীকে সরাসরি ২৫—১৪, ১৮—১৩ সেটে হারিয়ে।

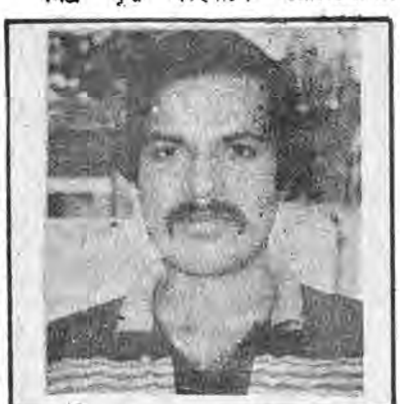
পুরুষদের ডাবলসে বিজয়ী কুমিল্লার জুটি ত্রিদিব ও তপন মেট্রোপলিটন ক্লাবের পেনু আর বিমলকে হারালেন ১৫—৭ ও ১৫—৭ সেটে।

মহিলাদের এককে বিমান দলের কামরুন নাহার ডানা সহজেই হারালেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মেট্রোপলিটন ক্লাবের মরিয়ম সিদ্দিকাকে ১১—৭ ও ১১—৪ পয়েন্টে।

মহিলাদের ডাবলসে বিমান দলের ডানা আর মুন্নি জুটি মেট্রোপলিটন ক্লাবের মরিয়ম ও রোয়েনা জুটিকে ২—১ সেটে হারিয়ে শিরোপা জিতলেন ২০ এপ্রিল রাতে। তিনটে ম্যাচে পয়েন্টের ব্যবধান ছিল ১২—১৫, ১৫—৭ এবং ১৫—১১।

মিক্সড ডাবলসে বিমান দলের ডানা ও বাবুল মেট্রোপলিটন ক্লাবের মরিয়ম ও পেনুকে সরাসরি ১৫—১৩ ও ১৫—৬ সেটে হারিয়ে শিরোপা জিতলেন।

এ প্রতিযোগিতার তিনটে বিষয়ে বিজয়ী হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ বিমানের কৃতি



প্রবীন সিং



স্নেহাংশু ভট্টাচার্য



পিরিস বরোডিসা

প্রতিযোগিনী কামরুন নাহার ডানা জিতলেন ত্রিমুকুট। আর দলগতভাবে মেট্রোপলিটন ব্যাডমিন্টন ক্লাব ২১ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা জিতলো। বিমান দল ২০ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স।

সরকারী ব্যয় বেড়েছে

বাংলাদেশে বর্তমানে খেলাধূলার প্রতি বেশ নজর দেওয়া হচ্ছে। এ খাতে সরকারী অনুদানও গেছে বেড়ে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও ক্রীড়া সরঞ্জামের ব্যবস্থাও হয়েছে উন্নত। তবু কেন জানি না ক্রীড়াঙ্গনের আশানুরূপ উন্নতি নজরে পড়ছে না। বিদেশী প্রশিক্ষক দিয়ে ব্যাডমিন্টনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তার কোন প্রভাব দেখা গেল না আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে। কেবলমাত্র দাঁড়ানো আর ব্যাট প্লেসিং-এর মধ্যেই মনে হল প্রশিক্ষণকে আয়ত্তে রাখতে পেরেছেন আমাদের খেলোয়াড়রা। অনুশীলনে অনুরাগী হয়ে ওঠেননি এখনও। অনেক অসুবিধার মধ্যেও যে খেলোয়াড়রা অনুশীলন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করে জাতীয় মানকে বাড়াতেন, আজ তাদের মধ্যে এমন অনীহার কারণ কি বুঝতে পারা যাচ্ছে না। খেলোয়াড়রা আরও নিষ্ঠাবান হোন। ক্রীড়াঙ্গনের উন্নতি আমরা সাংঘাতিক রকম কামনা করি। আর আমাদের এ কামনাকে বাস্তবায়িত করতে খেলোয়াড়রা আরও সচেষ্ট হোন, এটা কে না চায়!

বিহার ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় কি পাটনায় স্থানান্তরিত হচ্ছে ?

জামসেদপুর থেকে অমল ত্রিবেদী : বিহার ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র ইস্পাতনগরী জামসেদপুর। এই শহর পূর্বাঞ্চলকে উপহার দিয়েছে বাঘা বাঘা ক্রিকেটার। পন্টু চৌধুরী, বিমল বসু, কানু চক্রবর্তী এখানকার ছেলে। সম্প্রতিকালে রমেশ সাক্সেনা, দলজিৎ সিং, রবীন মুখার্জি, অঞ্জন ভট্টাচার্য, সুনীত সোম, কাজল চ্যাটার্জি, সুব্রত দাস, আশিস সিংহ এখানে খেলে সুনাম কুড়িয়েছেন। বাংলার সুঁটে ব্যানার্জি জামসেদপুরে গিয়ে বিহার ক্রিকেটকে চাঙ্গা করেন। এখনো বিহার রাজ্য দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯/১০ জন ক্রিকেটার থাকেন এই শহরে। কোটা সিস্টেম বজায় রাখার জন্য একজন করে পাটনা ও রাঁচির ছেলে দলে সুযোগ পান।

বিহার ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের সদর দপ্তর জামসেদপুরে। বিহারের রাজধানী পাটনায় সমস্ত সরকারী বেসরকারী ও ক্রীড়া সংস্থাগুলির কার্যালয় রয়েছে। পাটনার জনসাধারণ ও ক্রিকেট প্রেমীরা উঠে পড়ে লেগেছেন বি সি এ'র কার্যালয় তাদের রাজধানী শহরে স্থানান্তরিত করতে হবে। তাদের বাড়া ভাতে ছাই ফেলেছেন রুসী মোদি। মোদি সাহেবের স্বপ্নের জামসেদপুর এর ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা তিনি বোঝেন। ফলে পাটনায় যেমন একদিকে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে অপর দিকে জামসেদপুরের ক্রিকেট প্রেমীরাও বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

এখন প্রশ্ন : জামসেদপুর কেন চায়না—পাটনায় তাদের বি সি এ অফিস উঠে যাক? ইস্পাত নগরীর ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ও খেলোয়াড়রা কে কি বলছেন?

বিহারের সর্বকালের সেরা বোলার ও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বিমল বসু বলেন—এ রকম হলে বিহার ক্রিকেটের চরম সর্বনাশ হবে। জামসেদপুরে বি সি এ'-র যেটুকু ব্যাংক ব্যালেন্স হয়েছে সেটার দিকে অনেকের নজর। তাছাড়া ওখানে সুযোগ কই? পাটনা পারবে—জামসেদপুরের মত সারা বছর সব রকম সুযোগ সুবিধা দিতে?

প্রখ্যাত ক্রিকেটার কানু চক্রবর্তীর মতে—বি সি এ'র অফিস জামসেদপুর থেকে যেতেই পারেনা। যে যাই বলুক, যত আন্দোলনই হোক—বিহার রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা এখানেই থাকবে। পাটনায় যে দুটি রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা আছে—যতদূর জানি তাদের মধ্যে সম্প্রীতি নেই। তার ওপর আবার ক্রিকেট সংস্থার দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপলে পাটনা তো ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়বে। কয়েক বছর ধরে এরকম একটা গুজব উঠেছে যে বি সি এ পাটনায় উঠে যাবে। আমার মনে হয় এটা গুজবই থেকে যাবে।

প্রখ্যাত ক্রিকেটার দলজিৎ সিং ও রমেশ সাকসেনাও ঐ একই কথা বলেন—বি সি এ অফিস স্থানান্তরিত হলে টিসকো ও টেলকো কোম্পানির সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে তো বিহার ক্রিকেটের ভরাডুবি ঘটবে।

জামসেদপুরে অনেক ক্রিকেট প্রেমীকে জিজ্ঞাসা করেছি—সবাই একই কথা বললেন, —না না, এ অসম্ভব। হতেই পারেনা। ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছি। তাদের মতে—এতে বিহার ক্রিকেট ধ্বংস হবে। আমরা কিছুতেই তা সহ্য করব না। দরকার হলে পথে নেমে বিক্ষোভ জানাব। আন্দোলন করব। আমরণ অনশন করব।

সবশেষে ভাবছি—জামসেদপুরের এই ক্রিকেট পাগল ছেলেগুলোর কথা—যারা প্রয়োজনে ক্রিকেটের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। এদের প্রচেষ্টা কখনো অসফল হতে পারেনা। এরা যতদিন জামসেদপুরে থাকবে ততদিন এখান থেকে বিহার ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় পাটনায় স্থানান্তরিত করতে হলে এ আই সি সি'কে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

মাঠের ছড়া

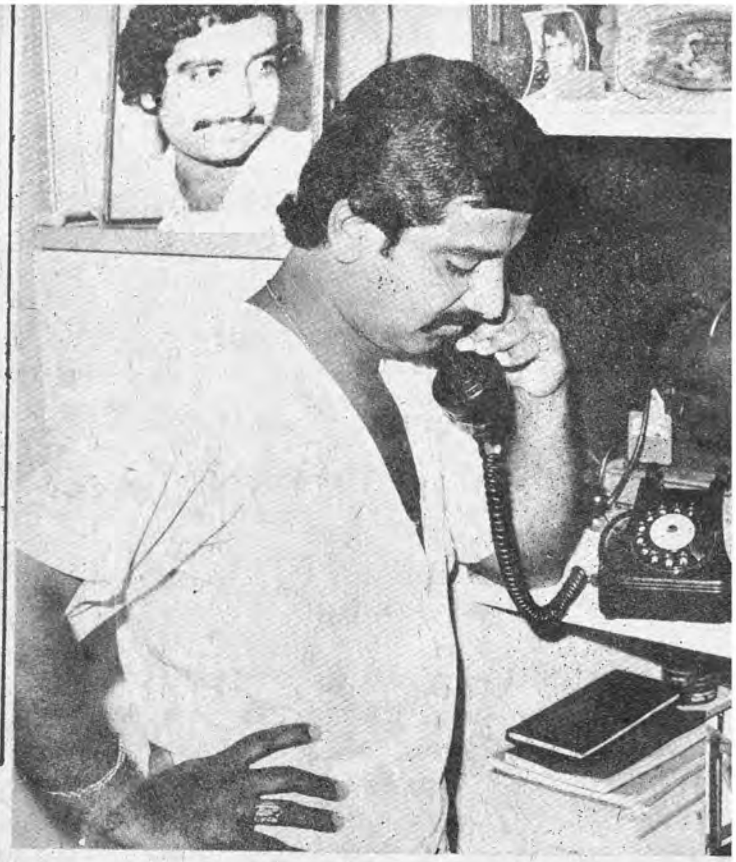
ভবানী প্রসাদ মজুমদার

তিষ্ঠ, ভায়া তিষ্ঠ!
দলাদলির ধার ধারি না
আমি মোহন-ইস্ট !!
যে-দল জেতে তাদের সাথেই
উল্লাসে ন্যায়-নিষ্ঠ!
গ্যালারিতে বোকার মতন
সদাই শান্ত-শিষ্ট!
জয় রাধা-জয় কিষ্ট!
দলাদলির ধার ধারি না
আমি মোহন-ইস্ট !!



এই যে ভায়া, শোনো-শোনো
ব্যাপার কিছু বুঝছো ?
কোন্ দলেতে ভীড় বাড়াবে
সেটাই সুযোগ খুঁজছো ?
মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল
কি বললে, আমি কোন্ দল ?
খেলার শেষেই বলবো সেটা
এখন রাখি উহ্য !!







সুখী গৃহকোণে বিশ্বনাথ

অসাধারণ লেট কাট, গ্লান্স আর ড্রাইভ। কব্জির প্রতিটি মোড় অপূর্ব লিরিক্যাল। ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজের ক্রিকেটার গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ—তার দুর্লভ মারগুলোকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবার বদলে মনে মনে তারিফ করতে ইচ্ছে করে।

বাঙ্গালোরের সুখী গৃহকোণেও বিশ্বনাথ পরিশীলিত মেজাজের গৃহস্থ। অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সুনীল গাভাসকরের বোন সুন্দরী কবিতা কিছুকাল আগে গৃহিণী হয়ে এসেছেন। অবসর সময় কবিতার সঙ্গলাভে মধুর হয়ে ওঠে। কখনো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে, তা সে খেলার হোক বা অন্য কোন ম্যাগাজিন হোক, সময় কাটান। ভাইঝিদের সঙ্গে তার অদ্ভুত ভাব, অনেকটা সময় ওরাই তো কেড়ে নেয়, কবিতাও তা উপভোগ করেন। কিন্তু 'রামী' খেলার সময় কবিতা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।







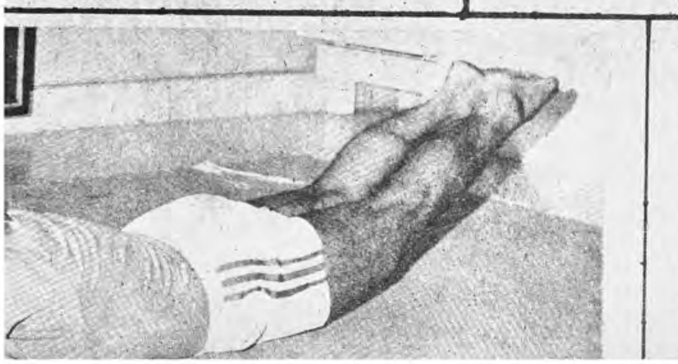


এরই ফাঁকে সময় করে নিয়ে ক্রিকেটের জন্য
রটাকে ঠিক রাখার ব্যায়াম করেন। মাঝে মাঝেই
ৰ্কদের ফোন আসে—-'হ্যালো ভিস!' নিজের
ন্দের ওপর বিশ্বনাথের আস্থা প্রবল—তাই পোশাক
ছ দেবার ব্যাপারে কবিতাকে সাহায্য করতে হয়
আর কোন এক মুহূর্তে কবিতা, গুণ্ডাপ্পার সঙ্গে
া বাবা, মা যখন যোগ দেন, তখন সুখী গৃহ-চিত্রটি
রা উজ্জ্বল মনে হয়।

ছবি

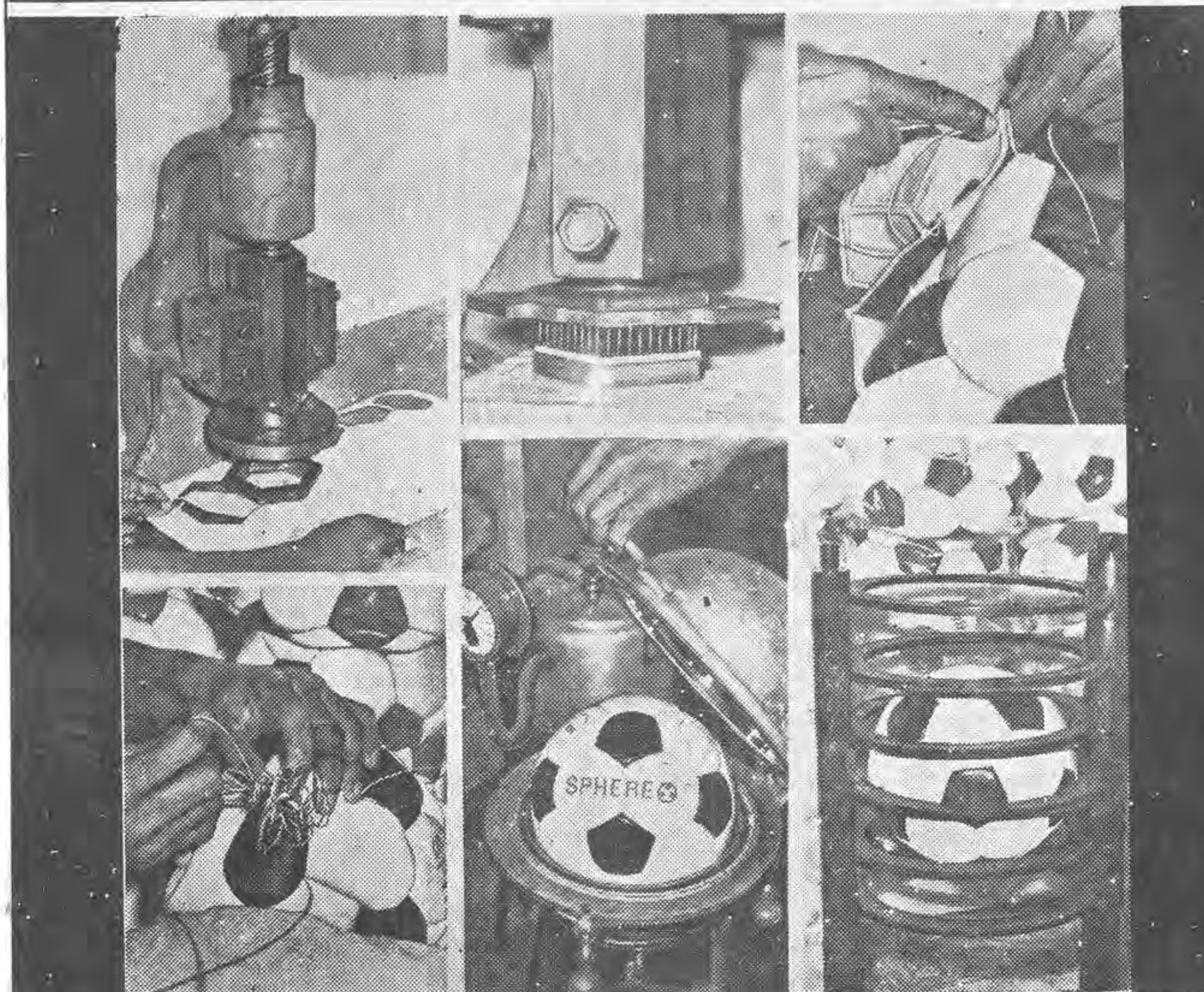
ডি জে আনন্দরাজ





ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুত শিল্পে বাংলা পিছিয়ে কেন

অশোক কুমার দাশগুপ্ত



চামড়ার টুকরো থেকে ঝকঝকে ফুটবল। ফুটবল তৈরির কয়েকটি বিভিন্ন স্তর

ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরিতে একদা পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতে পথিকৃৎ। এখন এ রাজ্যের সেই গর্ব নেই। বাংলার স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছে পাঞ্জাব, নানা দূর-দৃষ্টি দ্বারা। খেলোয়াড় তৈরির সঙ্গে বানাচ্ছে ক্রীড়া-সরঞ্জাম, বিদেশেও পাঠাচ্ছে ওইসব সামগ্রী। একটু চেষ্টা করলে বাংলাও কিন্তু এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

একজন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, একজন সুপার-ভাইজার, তিনজন ইন্সট্রাক্টার এবং চারজন মিস্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট এই ন'জনকে রেখেছেন প্রতিবছর ২৫ জন শিক্ষার্থীকে ক্রীড়া-সরঞ্জাম শিল্পে দক্ষ কারিগর বানাবার জন্য। ২৫ জনের মধ্যে কতজন প্রতিবছর দক্ষ কারিগর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া সরঞ্জাম শিল্পকে উন্নত করতে সাহায্য করছেন, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেমন মুস্কিল, ঠিক তেমনি যদি প্রশ্ন রাখা যায়—এই বিজ্ঞানের যুগে, কতটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ক্রীড়া-সরঞ্জাম শিল্পের উন্নতির জন্য ভাবছেন এই সংস্থার বিশেষজ্ঞরা, এর উত্তর পাওয়াও খুবই শক্ত। তবুও প্রতিবছর রাজ্য সরকার ব্যয় করে চলেছেন মোটা অঙ্কের টাকা বি টি রোডে অবস্থিত, **ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস-গুডস ট্রেনিং-কাম প্রোডাকশন সেণ্টারের** পিছনে, **যার বিনিময়ে রাজ্য** কিছুই পাচ্ছে না।

এই সংস্থায় শিক্ষার্থীদের যা যা শেখানো হয় তার মধ্যে প্রধান ফুটবল, ক্যারামবোর্ড, নেট, সাটলকর্ক ইত্যাদি। কিন্তু এসবই এই সংস্থার জন্মের বহু আগেই তৈরি হত এ রাজ্যে। প্রয়োজন ছিল, সেইসব ক্রীড়া-সরঞ্জাম প্রস্তুতের দিকে নজর দেওয়া যা এই রাজ্যে তৈরি হত না, আজও হয় না। তা হল ক্রিকেট ব্যাট, ক্রিকেট বল, র‍্যাকেট, হকি স্টিক ইত্যাদি। কারণ এইসব ক্রীড়া-সরঞ্জামের একটা বিরাট চাহিদা এ রাজ্যে রয়েছে এবং যা পুরোপুরি মেটাচ্ছে পাঞ্জাব। আর ফুটবল, যা এই সংস্থায় শেখানো হয়, তারই বা কতটা উন্নতি হয়েছে? বিশ্বের বাজারে তাল রেখে চলতে গেলে যতটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দরকার, তাও কি শিক্ষার্থীরা শিখছেন এই সংস্থার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে?

যতদূর জানা যায়, ভারতের প্রথম ফুটবলটি তৈরি হয়েছিল

কলকাতা শহরেই। কার অ্যাণ্ড মহলানবীশ (এখন নেই) এবং চৌধুরী কোম্পানীর দুই মালিকের সহযোগিতায়, দুখন আর ভুখন নামে দুই বিহারী যুবক তৈরি করেছিল ভারতের প্রথম ফুটবলটি। এর আগে, ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ম্যাগরেগার, টম-লিনসনের বল আসত ভারতে। কিন্তু স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে যখন আমদানী বন্ধ হতে থাকল, তখন কলকাতায় গড়ে উঠতে লাগল ছোট ছোট ফুটবল তৈরির কারখানা।

দেশ ভাগ হওয়ার পর ক্রীড়া-সরঞ্জামের শহর শিয়ালকোট যখন চলে গেল পাকিস্তানে. তখন পাঞ্জাবের জলন্ধরে আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে ক্রীড়াশিল্প। তারা তখন শীতকালীন ক্রীড়া-সরঞ্জাম তৈরি করতেই বেশী আগ্রহী। আর কলকাতার তৈরি বলের নাম তখন ভারত জোড়া

একসময় কলকাতার তৈরি বল নানাদেশ সফর করেছে ভারতীয় দলের সঙ্গে। ওর্লিম্পিকের আসরেও গেছে এই কলকাতার তৈরি বল। আর আজ কলকাতার এই শিল্পকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেছে জলন্ধর। শীতকালীন ক্রীড়া-শিল্পে সমৃদ্ধ জলন্ধর, ফুটবল শিল্পে দক্ষতা অর্জন দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলল ফুটবল শিল্পকে। এদিকে কলকাতায় এই শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই এখন একদা ফুটবল শিল্পে সমৃদ্ধ কলকাতাকে হাত পাততে হয় পাঞ্জাবের কাছে। আজকের কলকাতার ফুটবল শিল্পের এই নিদারুণ পরিস্থিতি খুবই লজ্জার।

আসলে আমরা শুধুমাত্র খেলার উন্নতি, খেলোয়াড়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিয়ে বৈঠক, সভা ইত্যাদিতে বড়ই ব্যস্ত। শিল্পের দিকে নজর দেওয়ার মত সময় বা ইচ্ছা নেই।

পাঞ্জাব যেমন তাদের ক্রীড়ামানের উন্নতির চেষ্টা করছে, তেমনি তার সঙ্গে সমান তালে ক্রীড়া-সরঞ্জাম শিল্পের উন্নতির কথাও ভাবছে। কিন্তু বাংলায় এই শিল্পের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য খুবই দুঃখের। অথচ এই শিল্পের উন্নতি হলে প্রথমত কিছু বেকার ছেলের রোজগারের পথ হতে পারে। দ্বিতীয়ত ভারতীয় বাজারে এর চাহিদা বাড়বে এবং তৃতীয়ত প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্কেটবল বা ওয়াটারপোলো বল আজ আর চামড়া দিয়ে প্রস্তুত হয় না। বদলে এসেছে নতুন ধরনের উন্নতমানের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত 'মোল্ডিং' করা বল,—যা ভারতেই হচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নয়। অতএব আমরা এই দুটি জিনিসও হারাতে বসেছি। বিশ্বের বহু কারখানায় এই ধরনের ফুটবল তৈরিরও প্রচেষ্টা চলেছিল, কিন্তু খেলোয়াড়রা এতে অসুবিধা বোধ করাতে, ফুটবলের ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তাধারা বিশেষজ্ঞরা ত্যাগ করেছেন। সুতরাং ফুটবল তৈরি হবে চামড়া দিয়েই। ওই বিশেষ ধরনের ফুটবল তৈরি হলে ফুটবল শিল্পকেও পশ্চিমবঙ্গ হারাত। অতএব তা যখন হয়নি, তখন এই শিল্পকে উন্নত করার চেষ্টাই বা হবে না কেন?

পাঞ্জাবে প্রস্তুত ফুটবলের শতকরা ৫০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। আর পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুত ফুটবলের বাজার বিদেশে কেমন? কতই বা রপ্তানি হয়? এব্যাপারে অবশ্য দিল্লিতে অবস্থিত 'স্পোর্টস-গুডস এক্সপোর্ট প্রোমোশান কাউন্সিলের' কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা কিছুই জানাননি। তবুও এ রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী যখন এর উৎপাদন কম, তখন এর বিদেশী বাজার থাকলেও রপ্তানি খুব একটা হয় না।

এবারে দেখা যেতে পারে, বাংলার ফুটবল শিল্পে এই নিদারুণ পরিস্থিতির কারণ কি? এর কোন উন্নতি সাধন করা যেতে পারে কি না। সরকারী সহযোগিতাই বা কতটা প্রয়োজন।

প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার, এটা নিতান্তই কুটির-শিল্প। এইসব শিল্পপতিদের পুঁজিও অল্প। ঘরে তৈরি বল স্টক করে রাখার মত ক্ষমতাও এদের নেই।

ফুটবল তৈরি করতে গেলে যা যা প্রধান কাঁচামালের প্রয়োজন, তা হল চামড়া, সুতো, ব্লাডার ইত্যাদি।

ফুটবলের উপযোগী চামড়া পুরোপুরি আসে মাদ্রাজ থেকে। ফুটবল প্রস্তুতকারকরা এই চামড়া সরাসরি মাদ্রাজ থেকে আনতে পারেন না, কারণ বেশী পরিমাণ চামড়া একসঙ্গে কেনার ক্ষমতা নেই। মাদ্রাজ থেকে চামড়া আসে পাইকারী বিক্রেতাদের কাছে, পাইকারী বিক্রেতার হাত ঘুরে চামড়া চলে যায় খুচরো বিক্রেতাদের কাছে, এবং অবশেষে খুচরো চামড়া বিক্রেতা মারফৎ আসে ফুটবল প্রস্তুতকারকদের কাছে। তাহলে মাদ্রাজের চামড়া প্রস্তুতকারক, পাইকারী এবং অবশেষে খুচরো চামড়া বিক্রেতা, মোট তিন হাত ঘুরে চামড়া এলে, তার দাম কত বেড়ে যায় প্রত্যেকে কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ লাভ করলেই চামড়ার দাম অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, এই খুচরো চামড়া বিক্রেতাদের কাছ থেকে কখনই ন্যায্য পরিমাপ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ২০ কিলো চামড়ার দাম দিয়ে ১৮ কিলো চামড়া নিতে হয়, এবং প্রস্তুতকারকরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি মাদ্রাজ থেকে সরাসরি চামড়া কিনে এই ছোট ছোট ফুটবল কারখানাগুলিতে অল্প লাভে বিক্রয় করেন, তাহলে একদিকে যেমন ফুটবল প্রস্তুতকারকদের সমস্যার একটা বিরাট দিক মিটবে, অন্যদিকে তেমনি ফুটবলের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ফুটবল-পাগলের দল বাঁচবে।

গত তিন মাসে চামড়ার দাম কিলো প্রতি ১০ থেকে ১২ টাকা বেড়েছে। চামড়া ব্যবসায়ীরা বলেন, নিজেদের দেশের চাহিদা না মিটিয়ে বিদেশে চামড়া রপ্তানি, এই দাম বাড়ার প্রধান কারণ। এছাড়া হঠাৎ হঠাৎ ঘরে চামড়া আটকে রেখে, চামড়া বিক্রেতারা কৃত্রিম চাহিদা বাড়িয়েও এর মূল্যবৃদ্ধি করে থাকেন ফলে, খেসারত দিতে হয় এ রাজ্যের ফুটবল ক্রেতাদের এবং ছোট ছোট ফুটবল কারখানার মালিকদের। অতএব সরকার যদি এ নিয়ে একটু ভেবে দেখেন, তাহলে মনে হয়, এ রাজ্যের নিষ্প্রাণ এই শিল্পটা আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে।

এ চামড়া সাধারণ মানের বলের জন্য। উন্নতমানের ফুটবল বা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ফুটবলের উপযোগী চামড়া পশ্চিমবঙ্গেই প্রস্তুত করা সম্ভব। সে কথায় পরে আসা যাবে।

এর পরেই প্রয়োজন সুতোর। বল সেলাইয়ের সুতো সারা ভারতবর্ষে তৈরি করে একটিমাত্র কারখানা (পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত)। এদের খেয়াল খুশীমত মূল্যবৃদ্ধির কারণেও বহু কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত। বলের মূল্যবৃদ্ধির এটিও একটি কারণ। গত তিন বছরে সুতোর দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। ➡



ছবি : লক্ষ্মণ নাগ দাস

সুতোর পরেই দরকার ব্লাডার। বিশেষ ধরনের রবারে (ল্যাটেক্স) প্রস্তুত এই ব্লাডার পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয় না। আসে ভিন্নরাজ্য থেকে। তবে সুতোর মত একটিমাত্র কারখানাতেই ব্লাডার সীমাবদ্ধ নয়। বহু কারখানাতেই ব্লাডার প্রস্তুত হচ্ছে। তবে উচ্চমানের ব্লাডার তৈরি হয় দুটি মাত্র কারখানাতে। মূল্যবৃদ্ধিতে এরাই বা কেন পিছিয়ে থাকবে?

এইসব বিভিন্ন কারণে আজ পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল শিল্প একদিকে যেমন মার খাচ্ছে, অন্যদিকে তেমন বলের দাম বাড়ছে হু হু করে। এই মরশুমে একটি সাধারণ বলের দাম ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। যা গত মরশুমের থেকে ১০ থেকে ১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফুটবলের কাঁচামালের এইসব অসুবিধার জন্য একদিকে যেমন ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার মুখে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের খেলা-পাগল ছেলেদের ভাবিয়ে তুলেছে। শুধু ফুটবলই নয়, সমস্ত ক্রীড়াসামগ্রীর এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আজ প্রতিটি ক্রীড়ারসিককে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের চিন্তায় ফেলেছে। কারণ খেলাধুলা আজ স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক। সুতরাং খেলাধুলা যখন শিক্ষারই একটি অঙ্গ, তখন এই মূল্যবৃদ্ধির উপর বিক্রয় কর, সারচার্জ ইত্যাদিও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত অভিভাবকদের গায়ে লাগছে।

কাঁচামালের বিরাট সমস্যা ছাড়া, ফুটবল শিল্পের আর একটি প্রধান সমস্যা কারিগর। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি কারিগরই অন্য রাজ্য থেকে আসছেন। অতএব প্রতিটি ফুটবল কারখানার মালিক এদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এদের নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হঠাৎ এদের দেশে যাওয়ার বায়না। প্রতিবছরই দেখা যায়, ফুটবল মরশুমে এদের একটা বিরাট অংশ দেশে চলে যায়, ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন কমে যায়, অন্যদিকে তেমন ছোট ছোট কারখানাগুলি মার খায়। অথচ যদি পাঞ্জাবের মত নিজ রাজ্যের কারিগর এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তাহলে প্রথমত এই সমস্যার হাত থেকে কারখানা মালিকরা বাঁচতে পারেন। দ্বিতীয়ত বহু বাঙালী ছেলের রোজগারের পথ হতে পারে। ভবিষ্যতে ভালভাবে কাজ শিখে নিজেই কারখানার মালিক হতে পারে।

তাহলে এ রাজ্যের কারিগর বানাবার দায়িত্ব কার? সেকথা, একদম শুরুতেই বলা হয়েছে। বি টি রোডে অবস্থিত রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের যে শেডটি রয়েছে তার নিচেই কারিগর বানাবার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিয়েছেন। দায়িত্ব নিয়েছেন ঠিকই, তবে তা কতটা পালন হচ্ছে তা বলা অবশ্য শক্ত।

ফুটবল শিল্পের উন্নতির পিছনে, বি টি রোডের ওই সংস্থার দানই বা কতটুকু? আজকের বহুল প্রচলিত, ভাল্ব-ব্লাডার দিয়ে প্রস্তুত ফুটবল (রাশিয়ান বল) ভারতে প্রথম প্রস্তুত হয়েছিল কলকাতাতেই।

১৯৫৫ সালে শৈলেন মান্নার নেতৃত্বে ভারতীয় দল খেলতে গেছিল রাশিয়ায়। সেখান থেকেই শৈলেন মান্না কিনে নিয়ে আসেন দুটি বল এবং চারটি ব্লাডার। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন এই নতুন উন্নতমানের বল প্রস্তুত করতে পারে, ভারত কেন পারবে না? এই চিন্তা সেদিন ঢুকেছিল শৈলেন মান্নার মাথায়। তারপর দেশে ফিরে শৈলেন মান্না এবং এক ফুটবল প্রস্তুতকারক স্বরাজ দাশগুপ্তের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর শাস্তুয়া নামে এক মিস্ত্রী তৈরি করল ভারতের প্রথম রাশিয়ান বল। যদিও প্রথম বলটির শেপ ভাল ছিল না। তবে দ্বিতীয় বল থেকে আর কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। আসলে, এই নতুন ধরনের বল তৈরি করাতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেলাইয়ের একদম শেষের দিকে।

অবশেষে এই সমস্যার সমাধান হল। ভারতে তৈরি প্রথম রাশিয়ান বলটি পড়েছিল মোহনবাগান মাঠে। আমাদের রাজ্যে এই ফুটবল শিল্পের উন্নতির জন্য শৈলেন মান্নার নিঃস্বার্থ সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

তবে এই বলের নাম রাশিয়ান বল কেন? এ ধরনের বল প্রথম কি রাশিয়াতে তৈরি হয়েছিল? শৈলেন মান্নার কাছে প্রশ্ন রাখতে তিনি বললেন, 'না, না, এই ধরনের বল প্রথম কে তৈরি করেছিল জানিনা। তবে এই বল যখন অল্প অল্প করে বাজারে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল, তখন তো এর একটা নাম দরকার। তাই স্বরাজদাই এর নাম দিলেন রাশিয়ান বল।' এই উন্নতমানের বল প্রস্তুত সরকারী সাহায্য ছাড়াই হয়েছে।

আগে বল তৈরির পুরো ব্যাপারটাই ছিল হাতের। কিন্তু এখন একমাত্র সেলাই ছাড়া অন্য সব যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। এতে প্রথমত বলের মান উন্নত হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অনেক।

১৯৭১ সালে, এই স্বরাজ দাশগুপ্তই মাদ্রাজের একটি ফুটবল কারখানাকে আধুনিকীকরণ করেছিলেন এই সব চিন্তা-ভাবনা দিয়েই। আধুনিক যন্ত্র বলতে, চামড়া কাটা, এবং সেলাইয়ের জন্য ছেঁদা করার ডাইস, (এতে বলের প্রতিটি সেলাইয়ের দূরত্ব হবে সমান এবং বলের শেপ ভাল হবে)। এছাড়া রঙ করার জন্য স্প্রে মেশিনের ব্যবহার। বল তৈরির পর শেপিং মেশিনে দিয়ে আরও সুন্দরভাবে শেপ করা। এইসব যন্ত্র ব্যবহারে বলের মান অনেক উন্নত হতে পারে, উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে পারে অনেক।

কিন্তু এতসব চিন্তাভাবনা, শিল্পের মালিকের সঙ্গে সরকারের বিশেষজ্ঞরাও যদি করেন, তাহলে এই শিল্পকে উন্নত করা যেতে পারে।

বিদেশে ফুটবল রপ্তানি বা উচ্চমানের ফুটবল প্রস্তুত করতে গেলে যে ধরনের চামড়ার প্রয়োজন, তার জন্য অবশ্যই অন্য রাজ্যের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। এ চামড়া এ রাজ্যেই প্রস্তুত সম্ভব। যে চামড়াকে বলা হয় 'ক্রোম'। এ ধরনের চামড়া ব্যবহারে বলের মান উন্নত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এর দাম হয়ে যাবে অনেক।

এই উন্নতমানের চামড়া প্রস্তুত করতে গেলে কিভাবে করতে হয়—সে ব্যাপারে এই রাজ্যে অবস্থিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা ও অন্যটি রাজ্য সংস্থা যৌথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিটগুলিকে দুবার হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।

সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তরফ থেকে বলা হয়েছে, তারা সবসময় সাহায্য করতে প্রস্তুত। চামড়ার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা হ'লে, যে কোনও ইউনিট তাদের কাছে আসতে পারে, যে কোন টেকনিক্যাল অসুবিধা হলেও তারা সমাধান করে দেবেন।

সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেদার ইণ্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ফুটবল শিল্পকে উন্নত করার কাজে লেগেছেন। ইতিমধ্যে তারা উন্নতমানের চামড়া প্রস্তুত করছেন এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এই শিল্পকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন আশ্বাস দিয়েছেন।

শুধু উন্নতমানের চামড়াই ফুটবল শিল্পকে বাঁচাতে পারে না। মনে রাখতে হবে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। বেশী দামে বল কেনার ক্ষমতা ক'জনেরই বা আছে?

পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল শিল্পের এই সংকটময় অবস্থার দিকে রাজ্য সরকারকে নজর দিতে হবে। নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এই শিল্পকে গড়ে তুলতে সাহায্য করলে, তাহলে শুধু ফুটবল শিল্প নয় সমগ্র ক্রীড়া সরঞ্জাম শিল্পের এক বিরাট অংশের প্রস্তুতকারকরূপে পশ্চিমবাংলা একদিন সারা ভারতে পথ দেখাতে পারে।

কি করে ফুটবলার হওয়া যায়  স্বরাজ ঘোষ দুই

ফুটবল খেলার মূল লক্ষ্যই হল গোলে পেঁৗছান। বলকে গোলের মধ্যে না ঢোকালে গোল হয় না। আবার বিপক্ষ দল গোলে বল ঢুকতে দেবে না। তার জন্য আছে আবার কঠিন প্রাচীর। এই কঠিন প্রাচীর ভেদ করে লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছতেই হবে। সেটাই হল খেলার বোল। এই লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছতে হলে খেলোয়াড়ী জীবনের প্রথম দিন থেকে কানে মন্ত্র নিয়ে সাধনায় এগোতে হয়। সেই সূত্রে চাই স্বাস্থ্য, চরিত্র, মন, ধৈর্য। চিন্তার কারণ নেই। লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছান যাবেই।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও ঠিক আগের চালে প্রায় এক যুগ চলে। তারপর এল এক নতুন চালের জোয়ার। সেই চালকে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়েছিল। কারণ চালটা শুরু হল নেতোর নেতৃত্বে অল রাশিয়া দল যখন ভারতে (১৯৫৫) খেলে গেল। আমরাও জর্জ ফ্লেটলের কোচিং তিনমাস একনাগাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে খেলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করলাম, তাদের ক্রীড়া বিন্যাস সম্পূর্ণভাবে কোচিং ভিত্তির উপর গঠিত। যদিও তখন বাঘা সোম, বলাই চ্যাটার্জি ও রহিম সাহেব ট্রেনিং দিতেন। তবে ব্যাপকভাবে নয়, তারা নিজ নিজ দল ও সাময়িকভাবে প্রতিনিধিমূলক খেলার জন্য রাজ্যদল বা ভারতীয় দলগুলোকে তালিম দিতেন। তখন বিশ্বে একমাত্র ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, ইংল্যাণ্ডই কোচিং শিক্ষা সব দেশকে দেওয়ার জন্য দুয়ার খোলা রাখত। তাদের 'কোচেস_ট্রেনিং' ছিল সবরকম বিষয় নিয়ে। এমনকি শিশুদের থেকে শুরু, জাতীয় দল অবধি কোচিং দেওয়ার বিষয় থাকত। এই শিক্ষা দিতে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আসর বসত। এক এক আসরে শিক্ষার্থী আসত ৮০ থেকে ৯০ জন। আর শিক্ষক ইংল্যাণ্ডের সমস্ত পেশাদারী ক্লাবের নামকরা কোচগণ। সংখ্যায় প্রায় ৮-১০ জন। এক এক বিভাগে ৮-১০ জন করে শিক্ষার্থী থাকত। শিক্ষার্থীগণ জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা খেলে ও খেলা শিখেই এই প্রশিক্ষণে যোগদান করে। তারা আসেন কি করে কম্পোজ করতে হয়, মাস্টারি করতে হয়, ছাত্রদের উপাদান চিনতে হয়, দল পরিচালনা করতে হয়, ছাত্রদের মন জানতে হয়, দায়িত্ব জানতে হয়, আর সামগ্রিক ফুটবলের উপর প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করতে হয় ইত্যাদি। এইসব শেখান হয়। তারপর পরীক্ষা। সেখানে বড় খেলোয়াড় আর অখ্যাত খেলোয়াড় সব এক হয়ে যান। পরীক্ষায় পাশ করা সে এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। কোন সুপারিশ চলে না। শিক্ষার্থীরা নিজেই বুঝতে পারেন তারা কোন স্টেজে আছেন। দেখেছি একই শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ৫-৬ বার একই কোচিং বিষয়ে যোগদান করেছেন। এদিকে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পাতিয়ালায়—এন আই এস-এর পরিচালনায় কোচিং ট্রেনিং চালু হয়। শুরু হয়ে যায় দলে দলে এন আই এস ট্রেনিং। আর শুরু হয়ে যায় সব দলে কোচ নিয়োগ। কিন্তু এত ট্রেনিং এত কোচিং, তবে দিন দিন ফুটবলের এই কঙ্কালসার চেহারা কেন? ত্রুটি কোথায়? কোচিং-এ ত্রুটি, না প্রশাসনে ত্রুটি? এ বিচার কে করবে? যাদের নির্মল চিন্তাধারা, তারাই বা কোথায়? কোথায় খেলাধূলার প্রতি ভালবাসা? চারিদিকে দেখি শুধু হিড়িক। আর শুনি চারিদিকে ভারতের ব্যর্থতা।

একদিন আমাদের দেশের চিত্তে খেলাধূলার প্রবাহ ছিল উদ্বেল। সেই উৎস কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ, সে পঙ্কিল ও ধারাবিহীন। খেলা যেখানে বলবান, গতিশীল, সেখানেই বিশুদ্ধ। পৌরুষের দুর্গতি সেখানেই ঘটে যেখানে নির্মল আনন্দ ও খেলা অন্তর্ধান করে কিম্বা বিলাস ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়। যেমন আজকালের খেলা।

খেলায় চাল আছে। চালক কৈ? দৌড়-ঝাপ আছে, পর্দা নেই। তবে বিশুদ্ধ খেলায় সুমতি আছে (প্রোপোরশান)। দেখার ভিড় কাউন্টার গণনা নয়। কাঁড়ি কাঁড়ি খেলা দেখা ও খেলার পুঁথি পড়ার দালালিতে পুরনো মুদ্রাকে উল্টে ফেলে শিল্প-সরস্বতীকে কাঁচকলা দেখাবার সাহস দিল কারা? মেকানিক্যাল কায়দায় আঙ্কিক গণনায় আধুনিক ফুটবলকে পেতে গিয়ে ভারত আর ফুটবল দুই খুইয়ে বসে আছে। ফুটবল-বিশারদ, প্রভাকর ইত্যাদি পাঠ্যসূচীর যুগপৎ প্রয়োজন আছেই। বিশেষ ক্রীড়াবিদদের পোষ্য ফুটবল জনতার মাঝখানে যেদিন খোলা রাস্তায়, সেদিন তাকে কুড়িয়ে রাখার মত বুদ্ধিমান সংগ্রহকারী আবার আমাদের খেলায় অন্য ধাচের শিক্ষা কেন্দ্র খুললেন। দোষ দেবার কিছুই নেই। যুগের হাওয়ার তাগিদ। শিক্ষার প্রসার। কিন্তু ঘুরে গেল। খেলা সাধনার। জনতার নয়, দর্শকের। খেলা শুধু দেহেরই নয়, স্বভাবের। ডিগ্রির নয়। এণ্টিবিল্লিটির। সাধের শুধু নয়। সাধ্যেরও।

খেলায় অনধিকার প্রবেশ ঘটল। গুণের প্রতি মূল্য না দিয়ে পরিমাণের দিকেই নজর দিল। দর্শকগণ চলে গেলেন মাঠের বাইরে। আর জনতা দখল করল সেই স্থান। বাক্সবন্দী গ্ল্যামারদের নিয়ে এলেন বিশারদ প্রভাকর হিসাবে। কিন্তু তা হয়না। তাই এই কালের গ্ল্যামারপূর্ণ খেলায় তালিম দিতে পারেনি। আর নয়ত জীবন-জীবিকায় গেছে গুলিয়ে।

শুধু লঘু মার্গের অনুশীলন করলে শাস্ত্রীয় মার্গে কোনদিনই পৌছান যায় না। সেটা হল 'ক্লাসিক'। জাতীয় খেলোয়াড় তৈরি করতে হলে খেলার বোল শেখাতে হয়। আর সাধনার সময় কানে বোল, মনে বোল, শেখাতে হয়। অর্থাৎ যা বর্জিত হয়না।

শিক্ষকদের অসঙ্গত শাসনে শিক্ষার্থীর শক্তির স্ফুরণ অনেক সময়েই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার বিকাশোন্মুখ সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়। তিনি প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে ভুল করবার স্বাধীনতা পর্যন্ত দেবেন। তা নাহলে সে যে সহজ গতিতে গড়ে উঠতে পারবে না। শিক্ষার্থীকে পজিটিভ ধারণা দিতে হয়।

খেলার বই পড়ে খেলা শেখা যায় না। শুধু প্রবণতা সৃষ্টি করা যায়। শিক্ষার্থীকে গুরু খুঁজে বের করতেই হবে। গুরু হাতে-নাতে সাবলীলভাবে গড়ে তুলবে। বিদেশীদের অনুকরণের প্রয়োজন কি? ব্রাজিল দল বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অনুকরণ ভঙ্গিমায় নয়। জাতীয় সম্পদকে মূল কাঠামো করে। আমরাই বা অনুকরণ করব কেন? জাতীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে মূলমন্ত্রের বীজ কানে প্রবেশ করিয়ে এগোনো কি যায় না?



[আগামী সংখ্যা থেকে খেলা শেখা]

যদৃষ্টং

ব্যাসদেব ঃ কেরী প্যাকার নামক পুণ্যাত্মাটির গ্রাস হইতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রাহুমুক্তি ঘটিতে আর কতকাল ব্যয় করিতে হইবে ক্রিকেট-বিশ্বের সম্মুখে এই প্রশ্নটির পুনরাবির্ভাব এক্ষণে যত না বেদনাদায়ক তদপেক্ষা অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের স্পর্ধা, হঠকারিতা ও চরিত্র পরিবর্তনের দায়জনিত কলঙ্ক বেশী বৈ কম কিছু নহে।

গত এপ্রিলে ক্রিকেট ম্যাচের টেলিভিসন প্রচার সত্ত্ব প্যাকারের হস্তে পুনঃ সমর্পণ অন্তে মাঝপর্বের এই স্বল্পকালেই অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের কেরী প্যাকারের পদ লেহনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা সীমাহীনতার পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভারতের সংক্ষিপ্ত অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিলের চিন্তা তাহারই পরিণতি মাত্র। প্যাকারের সার্কাসে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় কটিকে ব্যস্ত রাখিতে বোর্ড ভারতের সফর বাতিল করিয়া এক ক্রিকেট মহোৎসবের কার্নিভালের প্রস্তাব করিয়াছে।

লক্ষ্যণীয় যতটুকু তাহা হইল পূর্ব নির্ধারিত এই সফর বাতিলের ব্যাপারটি এখনও বেসরকারী পর্যায়ে রাখা হইয়াছে। বোর্ড ও তাহার আড়কাঠি প্যাকারের উদ্দেশ্য শুধু ভারত ও অন্য দেশগুলি তথা আই সি সি'র মনোভাব যাচাই করিয়া লওয়া। এবং অনুকূল মনে হইলে যথাকালে তাহার গাত্রে সরকারী মোহর দিয়া আই সি সি'র অনুমতি আদায় করিয়া লওয়া।

কেরী প্যাকার নামক অর্থ সর্বস্ব চরিত্রটির ক্রিকেট ব্রহ্মাণ্ড ক্রয় করিবার ইচ্ছায় বাদ সাধিয়া যাহারা তাহার কুনজরে (!) পতিত হইয়াছে অনস্বীকার্যভাবে ভারতও সেই দলে। এই ভূখণ্ডের কয়েকটি ক্রিকেটারের ওই ভণ্ড চরিত্রের পশ্চাদধাবনও যে সম্ভব হয় নাই তাহার পিছনেও ছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী। স্বভাবতই একদা তাহার প্রধান শত্রু অস্ট্রেলিয় বোর্ডকে মোহাবিষ্ট করিবার পর কেরী প্যাকার তাহার অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার লালসায় পশ্চাত হইতে এই সফর বাতিলের চিন্তা অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের মস্তকে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাহস ও দম্ভের নিকট নতি স্বীকারের জ্বালা যে তাহাকে আজও খোঁচা দিতেছে তাহা বুঝিতে অসুবিধা কোথায়

অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের চরিত্র ও আচরণ বদলে আজ আর যাহাই থাকুক বিস্ময় নাই। খেলাধূলার আঙিনায় সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তম লড়াই-এ একদা তাহারা ছিল প্রধান একটি পক্ষ। ট্র্যাডিশনাল ক্রিকেটের মরণ-বাঁচন সমস্যার কালে তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান দুটি বৃহৎ শক্তির একটি ছিল ভারতই, প্যাকারের মোহে আচ্ছন্ন অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডের অকৃতজ্ঞতায় তাহা আর ভুলিয়া যাওয়া যায় কিরূপে। প্যাকারের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয় বোর্ডের সংগ্রাম-এ সোচ্চার ও ফলদায়ী সমর্থন যে নেহাতই অপাত্রে অর্পণ হইয়াছে এমত চিন্তা আজ কাহাকেও ক্ষত-বিক্ষত করিলেও নীতির প্রশ্নে বিবেকের সহিত বেইমান না করিবার স্মৃতি অনন্তকাল ধরিয়াই সেই ক্ষতে প্রলেপের কাজ করিবে।

সফর বাতিলের জন্য অস্ট্রেলিয় বোর্ডের হঠকারী চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে টেস্ট ও কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধি চার্লস পামারের সাম্প্রতিক ভারত সফর ও বোর্ড কর্তাদের সহিত গোপন আলোচনাও বিরাট অর্থবহ। যতটুকু জানা যাইতেছে তাহাতে ইহাই স্পষ্ট, অস্ট্রেলিয়া এমত কার্য যদি করে তবে তাহাতে ইংল্যাণ্ডেরও সমর্থন নাই। একই সময় ইংল্যাণ্ডেরও অস্ট্রেলিয়া সফর পাকা হইয়া আছে। প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ড সেই সফর বাতিলও করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়া স্বদেশে ভারতের সফর বাতিল করিলে তাহার পূর্বেই সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফর বাতিলের হুমকীও ইতিমধ্যেই শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

আরও এক পূর্ব-নির্ধারিত সফর তথাকথিত ক্রিকেট কার্নিভালের ধাক্কায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কার্নিভালে অংশগ্রহণ করিলে ওই সময় তাহাদের নির্ধারিত নিউজিল্যাণ্ড সফরও পণ্ড হইবে। নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট কাউন্সিল ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

আগের প্রশ্নটি আবার আসিয়া পড়িতেছে। অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ডকে শিখণ্ডী করিয়া আড়াল হইতে কেরী প্যাকারের কাঠি নাড়া বাস্তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আবার সমস্যার স্রোতে টানিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। অস্ট্রেলিয় ক্রিকেট বোর্ড দেওয়ালের লিখন পঠনে অক্ষম হইলে তৎসৃষ্ট দেনা তাহাদেরই শোধ করিতে হইবে ইহাও যেমন আশ্চর্যের কিছু নহে, তেমনই কেরী প্যাকারের মোহ যে মরীচিকা বৈ কিছুই নহে ঘোর কাটিবার পর তাহাদের ইহা ছাড়া অন্য কিছুই উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই।

বিদেশ গেল ওরা

তাপসকুমার পাল



যাচ্ছে বিদেশ সানি—
ভীষণ তিনি মানী!
ছক্কা নাকি চার হাঁকাবেন?
—চলছে কানাকানি!!

বেস্ট ব্যাটসম্যান ভিশ্,
শ'য়েই করেন মিস্!
ইংল্যাণ্ডে করবেন কি?
—সবারই ফিস্ ফিস্!!

বোলার সে এক বেদী—
ভীষণ তিনি জেদী!
ভাঙবেন কি গিবস্-রেকর্ড?
টেস্টে নাকি ছেদ-ই?

দলনায়ক ভেঙ্কট,
নেয় উইকেট পট্পট্!
আনতে কি সে পারবে রাবার
সাজিয়ে এ দল চট্পট্?

আন্তঃজেলা খো-খো-য় ২৪ পরগণার দ্বিমুকুট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ থেকে ৩ জুন বারুইপুর মদারাট পপুলার একাডেমি স্কুলের মাঠে দ্বিতীয় বার্ষিক আন্তঃজেলা খো-খো প্রতিযোগিতা হল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে। পুরুষ ও মহিলা—উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে চব্বিশ পরগণা। ছেলেদের বিভাগে রানার্স নদীয়া এবং মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদ। মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদেরই এই দ্বিতীয় হওয়াটা অবশ্যই কৃতিত্বের।

এবারের প্রতিযোগিতায় মোট নয়টি জেলা অংশ নেয় —চব্বিশ পরগণা, কোচবিহার, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পুরুলিয়া। এদের মধ্যে প্রথম ছয়টি জেলার ছেলে ও মেয়ে দুটি বিভাগেই খেলেছে। বর্ধমান ও বাঁকুড়া এবার আসেনি। এবারের আসরে অনেক নতুন মুখের সন্ধান মিলেছে। রাজ্য খো-খো সংস্থা রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের এই প্রতিযোগিতায় নামতে দেয়নি। এটা ভালো পদক্ষেপ।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার খেলায় উত্তেজনা থাকলেও মহিলা বিভাগে চব্বিশ পরগণা—মুর্শিদাবাদ ফাইনালটি হয়েছে একপেশে। চব্বিশ পরগণা জিতেছে ইনিংস ও দুই পয়েন্টে। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছে ছেলেদের বিভাগে চব্বিশ পরগণার ননীগোপাল দেবনাথ এবং মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদের নিয়তি সিন্হা। পুরুষ বিভাগে বিজয়ী ও রানার্স দল :



আন্তঃজেলা খো-খো ফাইনালে মুর্শিদাবাদের মেয়েরা

পুরুষদের বিজয়ী ২৪ পরগণার ছেলেরা



চব্বিশ পরগণা : কাজল বসু (অধিনায়ক), কার্তিক চক্রবর্তী, তপন ভট্টাচার্য, ননীগোপাল দেবনাথ, অঘোর দাস, প্রফুল্ল পাল, প্রদীপ পাল, গোপাল নিয়োগী, নিমাই দাস, অশোক পণ্ডিত, ভোলানাথ দাস ও প্রদীপ দাস।

নদীয়া : মধুসূদন মণ্ডল (অধিনায়ক), ধ্রুবতারা রায়, অজয় বিশ্বাস, প্রসূন চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ দাস, রণজিৎ হালদার, সুরজিৎ নন্দী, অশোক পাল, মলয় ভদ্র, মধুময় রায়, কার্তিক বল ও পান্নালাল দত্ত।

মহিলা বিভাগে বিজয়ী ও রানার্স দল :

চব্বিশ পরগণা : কানন দাস (অধিনায়িকা), শীলা বসু, অনিমা পাল, শিখা দাস, স্বপ্না শী, রমা দাস, ঝরণা দাস, বিউটি দাস, সুপর্ণা দেবনাথ, পলি চক্রবর্তী, রঞ্জনা গাঙ্গুলি ও মনিকা দাস।

মুর্শিদাবাদ : শ্যামলী ভট্টাচার্য (অধিনায়িকা), নিয়তি সিংহ, উমা দত্ত, বিভা সাহা, ইতি সিন্হা, স্বপ্না রায়, পপী পাল, নারায়ণী চৌধুরী, পাপ্তালি পরামানিক ও স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য।

●

ইয়টিং-এ ভারতের উন্নতির জন্য উদ্যোগ

বোম্বাই থেকে নারায়ণ ঠক্কর ঃ পালতোলা নৌ-চালনা (ইয়টিং) কে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে ইয়টিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া এক 'নতুন কর্মসূচী' নিয়ে নেমে পড়েছে। এর ফলে এই ওলিম্পিক ইভেণ্টে ভারতের মান বাড়বে।

কর্মসূচীটি ঃ ৮ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রচুর সংখ্যক পালতোলা নৌ-চালক (ইয়টম্যান) গড়ে তোলা। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল ব্রিগেডিয়ার হরি কাপুর নিজে একজন এদেশের উঁচুস্তরের ইয়টম্যান। ১৯৭১-এর আগস্টে বৃটেনের হুইটস্টেবল-এ বিশ্বক্যাডেট শ্রেণীর জলক্রীড়া এবং পশ্চিম জার্মানির কিয়েল-এ প্রাক ওলিম্পিক জলক্রীড়ায় (অপটিমিস্ট শ্রেণী) দর্শক হিসেবে উপস্থিত হয়ে ব্রিগেডিয়ার কাপুর এই নতুন কর্মসূচীটি নিয়ে ভাবনা শুরু করেন।

হুইটস্টেবলে ইয়টম্যানরা ছিল ১৭ বছর বা তার কম বয়সী, আর কিয়েলে ১৫ বছর। দু'জায়গাতেই ব্রিগেডিয়ার দেখেন বেশীরভাগ ৮ থেকে ১২ বছরের কিশোর প্রতিযোগী। ১২ থেকে ১৬ নট (এক নট ঘণ্টায় ৬০৮০ ফুট দূরত্ব অতিক্রমণ) হাওয়ার গতিবেগে এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এই ছোট্টরা যেভাবে নৌকো চালায় তা দেখে তিনি চমৎকৃত হন।

অনেক প্রস্তুতির পর এক চালক বিশিষ্ট অপটিমিস্ট শ্রেণীর পালতোলা নৌচালনার জাতীয় আসর গত ২০ থেকে ২৭ মে খাদাকওয়াসলা লেকে বসেছিল। প্রথম



কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী ৯ বছরের রাজি পামি



রাজি পামি রেসে

বারদিন প্রতিযোগীদের এক শিক্ষণ শিবির হয়। শেষ তিনদিন চলে প্রতিযোগিতা।

চণ্ডীগড়, ভাতিন্দা, জব্বলপুর, সেকেন্দ্রাবাদ মাইথন ও বোম্বাই থেকে প্রতিযোগীরা যোগ দেওয়ায় বেশ জমজমাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুনে থেকে দুই কিশোরী সুজাতা মালকানি ও রাণী রঘুবীর সিং যোগ দেওয়ায় আসর এক সার্বিক রূপ ধারণ করে।

প্রতিযোগীদের সর্বকনিষ্ঠ ভাতিন্দার রাজি পামি ন'বছরের, আর বয়োজ্যেষ্ঠ বোম্বাই-এর ভিভিয়ান আলমিডা পনেরোটি জন্মদিন পার হয়ে এসেছে।

ছ'টি করে রেস হলেও পাঁচটির সময় যোগ করেই স্থান নির্ধারণ করা হয় (যেকোন একটি সময় প্রতিযোগীদের ইচ্ছানুযায়ী বাদ দেওয়া হয়)।

প্রতিযোগিতায় ভিভিয়ান আলমিডা শীর্ষ-স্থান দখল করে। মাইথনের সিদ্ধার্থ জৈন দ্বিতীয় এবং কোর অব ইঞ্জিনীয়র সেইলিং ক্লাবের নিকু মালিক তৃতীয় হয়।

ইয়টিং-এ ভারতের স্থান বিশ্বপর্যায়ে খুব খারাপ নয়। ১৯৭৫ সালে এদেশে অনুষ্ঠিত ক্যাডেট শ্রেণীর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে ফারুখ তারাপোর ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। অবশ্য আমাদের দেশে ১৮ বছরের নীচে ইয়টম্যান খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই ব্রিগেডিয়ার কাপুর এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মেজর জেনারেল পি আর পুরী (সভাপতি, ন্যাশনাল অপটিমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন), ও পি সি জৈন (কমোডোর, মাইথন ইয়ট ক্লাব) এ কাজে সর্বশক্তি নিয়ে কাপুরের পাশে দাঁড়ান।

ঠিক হয়েছে, আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে বোম্বাইতে দ্বিতীয় অপটিমিস্ট জলক্রীড়ার আসর বসবে। আর আগামী নভেম্বরের বিশ্ব আসরে আলমিডাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আশা করা যায়, আলমিডা ভালো ফল করবে। ■

ডাকটিকিটে খেলাধূলা

তপন রায় : সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টনে ইন্দোনেশিয়া এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত তিনবারের বিজয়ী ইন্দোনেশিয়া ফাইনালে ব্যাডমিণ্টনের অপর এক মহীরূহ ডেনমার্ককে হারিয়েছে শোচনীয়ভাবে ৯-০ ম্যাচে। এই নিয়ে পরপর চারবার টমাস কাপ জিতে ইন্দোনেশিয়া একটি অনন্য নজির সৃষ্টি করল। এর আগে আর কোন দেশ এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেনি। অবশ্য মালয়েশিয়া - ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে অর্থাৎ প্রথম তিনবার পরপর টমাস কাপ জয়ের শিরোপা পায়। টমাস কাপের মোট এগারটি আসরের সাতটিতেই চ্যাম্পিয়ন হল ইন্দোনেশিয়া।



১৯৪০ সালে স্যার জর্জ টমাস এই কাপটি দান করেন ও তার নামানুসারেই এই কাপটির নামকরণ হয়েছে 'টমাস কাপ'। সম্পূর্ণ রুপোর তৈরি ও ৭০ সেমি লম্বা এই কাপটি ব্যাডমিণ্টনে পুরুষদের আন্তর্জাতিক দলগত প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। প্রথম প্রতিযোগিতাটি হয় ১৯৪৮ সালে। সেবার মালয়েশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়। এই একই প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ক্ষেত্রে যে কাপটি দেওয়া হয় তার নাম 'উবের কাপ' এবং এটি দান করেন মিসেস এইচ এস উবের। ১৯৫৭ সালে প্রথম মহিলাদের প্রতিযোগিতা হয় ও চ্যাম্পিয়ন হয় আমেরিকা। টমাস কাপ ও উবের কাপ—এই উভয় প্রতিযোগিতাই পরিচালনার দায়িত্ব ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের।

যাই হোক, 'টমাস কাপ' ও 'উবের কাপ' —ব্যাডমিণ্টনের এই দুই বিখ্যাত কাপের দৃশ্য আমরা ছবিতে প্রকাশিত দুটি ডাকটিকিটে দেখতে পাই। ডাকটিকিট দুটি ব্যাডমিণ্টনের বিখ্যাত দেশ ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৬ সালের দশম টমাস কাপ জয় উপলক্ষে প্রকাশ করে। এছাড়া আরও একটি ডাকটিকিট এই সিরিজে প্রকাশিত হয়। সেটিতে 'টমাস কাপ' ও 'উবের কাপ' এই দুই কাপের দৃশ্যকে একসঙ্গে ছাপান হয়। এই ডাকটিকিট তিনটি ব্যাডমিণ্টনের বিখ্যাত পুরস্কারের সঙ্গে আমাদের সকলের সম্যক পরিচয় ঘটায়। ●



দ্বিজুদার আশেপাশে

একটা সাংঘাতিক ব্যাপার

দিগদর্শক : দ্বিজুদা, সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটেছে। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন উপেনদের বাড়িতে। দ্বিজুদা বললেন, কী হয়েছে কি? ভোম্বল এবং তাপস একসঙ্গে বলল, একজন লোক ওদের আটতলার ছাতে উঠে তার কার্নিশে গিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে নিচের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে সুই-সাইড করবে।

—অ্যাঁ, সুইসাইড করবে? কেন?

ভোম্বল বলল, কেন কে জানে। লোকটিকে কেউ চেনে না। সকালে গিয়ে ছাতে উঠেছে।

দ্বিজুদা চটপট উঠে পড়লেন। বললেন, না-না, এ হতে পারে না। সুইসাইড? লোকটার বয়স কেমন?

তাপস বলল, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, এলোমেলো চুল।

দ্বিজুদা একথা শুনে দরজার পাশে রাখা একটা বেতের ছড়ি নিলেন। বললেন, ওর দুঃখটা কি?

—কে জানে কি। বোধহয় চাকরী-টাকরী পাচ্ছে না, কিংবা··· । কিন্তু যে কথাটা তার মনে হয়েছিল সে কথাটা সে দ্বিজুদাকে বলতে পারল না, কে জানে দ্বিজুদা কী মনে করবে এই ভেবে।

—চলো। উপেনদের বাড়িটা কোন্ দিকে যেন?

—এই তো কাছেই। বলল ভোম্বল। এবার আমার পেছন পেছন আসুন।

দ্বিজুদা চটপট পায়ে চটি জোড়া গলিয়ে নিলেন। আবার বিছানার তোষকের তলা থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলেন। ভোম্বল বুঝতে পারল না, দ্বিজুদার এখন টাকার কি দরকার।

কিন্তু বোঝা গেল একটু পরেই।

দ্বিজুদা পাঁচ টাকার ছানার জিলিপি কিনলেন, বিখ্যাত সরাইরামের দোকান থেকে। সরাইরামের দোকানের জিনিস এখনও খাঁটি আছে বলে বাজারে নাম আছে। জিলিপি কিনে দ্বিজুদা বললেন, এবারে চলো উপেনের বাড়ি। না, না, ঠিক বাড়ি নয়—উপেনের বাড়ির ছাত।

দ্বিজুদা গিয়ে দেখলেন ছাত ভর্তি অনেক মানুষ। সকলেই উত্তেজিত।

অনেকেই দ্বিজুদার পরিচিত, আবার অনেকেই নয়। যারা পরিচিত তারা হর্ষধ্বনি করে উঠল। ভাবটা এই যে এবারে দ্বিজুদা একটা কিছু করবেন।

দ্বিজুদা দেখলেন ছাতের রেলিং-এর অন্য-দিকে যে সামান্য চলতে মত জায়গা থাকে সেখানে সত্যিই একটা ছোকরা বসে আছে।

দ্বিজুদা গম্ভীরভাবে বললেন, অ্যাই, ওখানে হচ্ছে কি?

লোকটি চুপ করে রইল। কোনো কথা না বলে একবার নিচের দিকে থুথু ফেলল।

দ্বিজুদা বললেন, কী, মতলবখানা কি বলো তো? তোমার হয়েছে কি?

লোকটি বলল, হয়েছে আবার কি। কিছু হয়নি। কিছু হয়নি বলেই আমি একটু পরে লাফিয়ে পড়ব আর মরব।

দ্বিজুদা বললেন, বটে? মরবে—কিন্তু কেন মরবে বাছা।

লোকটি বলল, কেন মরব তো বললাম, আমার কিছু হয়নি। না লেখাপড়া, না চাকরী, না অন্য কিছু। আমি একেবারে হতাশ!

দ্বিজুদা বললেন, ওসব বাজে কথা। হতাশ হওয়া প্রকৃতির বিধান নয়। দেখ, কী চমৎকার পৃথিবী, কী চমৎকার সূর্য। এই সূর্য কিরণ আমাদের এই পৃথিবীকে তাপ দিচ্ছে। ওই দেখ মেঘ, কালো কালো মেঘ। ধেয়ে চলেছে—তপ্ত মৃত্তিকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে করে তুলবে উর্বরা, করে তুলবে শস্যশ্যামলা। দেখ তাকিয়ে কী চমৎকার এই বিশ্ব। কত পাহাড়, কত মানুষ, কত নদী আর কত ফুল।

লোকটি বলল, আপনার ওই রাবিশ আমি শুনতে চাই না।

দ্বিজুদা থতমত খেয়ে বললেন, রাবিশ হল এসব কথা?

লোকটি বলল, রাবিশ ইন টু থারটি, অর্থাৎ কিনা ত্রিশ গুণ রাবিশ।



দ্বিজুদা বললেন, তারপর এই যে দেখ সরাইওলার ছানার জিলিপী। তোমার জন্যই এনেছি। নাও না, একটা নাও!

লোকটির চোখ চক চক করে উঠল। জিভ দিয়ে তালুটা চাটল। তার দৃষ্টিতে দেখা গেল লোভের রশ্মি।

দ্বিজুদা এগিয়ে গেলেন শালপাতা নিয়ে।

লোকটি হাত বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজুদা তার দুটো হাত জাপটে ধরে চমৎকার এক কৌশলে তাকে ছাতের মধ্যে এনে ফেললেন। শালপাতার ঠোঙা পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু ভাগ্য ভাল জিলিপীগুলো নষ্ট হয়নি।

লোকটা গ্রো-গ্রাসে জিলিপী খেতে লাগল।

বলল, একটু জল।

তাকে জল দেওয়া হল।

মনে হল এ যাত্রা লোকটি বেঁচে গেল।

দ্বিজুদা তখন তাকে বললেন, বেঁচে থাকার মত কিছু না। এই যে দেখছ সমস্ত জগত এখানে সকলে বেঁচে থাকার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে জানো ত, নেভার সে ডাই। এই পৃথিবীতে কত মজা। কত খেলা, কত নাটক, কত ক্রিকেট···।

লোকটা বলল, আমি ক্রিকেট ঘৃণা করি।

দ্বিজুদা বললেন, ক্রিকেট ঘৃণা করো? তোমার কোনো শিক্ষা দীক্ষা সত্যিই হয়নি। আচ্ছা, ক্রিকেট ঘৃণা করো, তাহলে ফুটবল?

লোকটি বলল, ফুটবলে আমি লাথি মারি। থুথু দিই! বলে সে মাটিতে থুথু ফেলল।

দ্বিজুদা বললেন, ফুটবলে লাথি মারা খারাপ কিছু নয়, কিন্তু থুথু দেওয়াটা ঠিক ভদ্র রুচির পরিচয় নয়। কত ক্লাব রয়েছে, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, কালিঘাট, মহমেডান স্পোর্টিং···।

লোকটি বলল, গোল্লায় যাক ওইসব ক্লাব

দ্বিজুদা খুবই ব্যথিত হলেন। বললেন, তুমি কি সত্যি সত্যিই কোনরকম খেলা ভালবাস না, কোনো খেলাতেই তোমার উৎসাহ নেই!

লোকটি বলল, সব গোল্লায় যাক!

দ্বিজুদা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেশ তাহলে—তোমার এই দুনিয়ায় থাকার কোনো অর্থ হয় না। আমি আর তোমাকে ধরে রাখব না। কী বলছিলে তুমি ছাত থেকে লাফাবে? যাও লাফাও, আমি আপত্তি করব না। খেলা পছন্দ কর না, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, কালিঘাট, মহমেডান স্পোর্টিং গোল্লায় যাক? বটে!

দ্বিজুদা আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বাড়িতে ফিরে এলেন। ●

গ্রামীণ খেলাধূলায় মালদা এগোচ্ছে

বিপ্লব তালুকদার ঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ খেলাধূলার উন্নতি প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ খুব এগোয়নি।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাতেও উল্লিখিত এই খেলাধূলার হাল একই রকম। শহর কেন্দ্রিক ক্রীড়া সংগঠনগুলো সারা বছর কাটিয়ে দেয় শহরের বিভিন্ন ধরনের সংগঠন করতেই। গ্রাম্য এলাকার সতেজ সবুজ অনেক প্রতিভাধর খেলোয়াড় শহুরে কর্মকর্তা-দের বাস্তুতায় নিজেদের স্থান পাকা করে নিতে সক্ষম হন না। উত্তরবঙ্গে এ ব্যাপারে একটু স্বতন্ত্রতার পরশ এনেছে মালদা জেলা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তারা। গতবছরে মালদা জেলা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা গঠিত হয়েছে নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে। শহরকেন্দ্রিক খেলাধূলা পরিচালনার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর অচলায়তন ভেঙ্গে নতুন কর্মকর্তারা নজর দিয়েছেন গ্রামীণ খেলাধূলা কি করে উন্নত করা যায় সেদিকেও।

মালদা জেলা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার কর্মকর্তারা নির্বাচিত হবার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তারা গ্রামাঞ্চলে খেলাধূলাকে জনপ্রিয় করে তুলবেন এবং খেলাধূলায় গ্রামের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন। এ ব্যাপারে তারা ব্লক-ভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করবেন। ব্লক-ভিত্তিক খেলার মাঠের ব্যবস্থা করে অনুশীলনের উপকরণ এবং সরঞ্জামাদি সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে ব্লক-ভিত্তিক অনুশীলন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করবেন। গ্রামাঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কিশোর খেলোয়াড়দের জেলা-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ভাবে অনুশীলনের সুযোগ করে দেবেন এবং ক্রমান্বয়ে তার সম্প্রসারণ করবেন। প্রতিভাবান ও সঙ্গতিহীন খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য এবং তাদের জীবিকার সুযোগ কি করে করা যায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য দেবেন। আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ও সহজে গ্রহণযোগ্য খেলাধূলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে তার অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

গ্রামীণ খেলাধূলার প্রথম পদক্ষেপ ফুটবল দিয়ে। গ্রামীণ ফুটবল প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে হয়েছে। প্রথমে ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের দলগুলো থেকে শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলকে নিয়ে ব্লকের দল এবং সব শেষের স্তরে ব্লকের শ্রেষ্ঠ দলের সঙ্গে অন্য ব্লকের শ্রেষ্ঠ দলের মধ্য থেকে জেলার চ্যাম্পিয়ন ব্লক নির্বাচন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলা হয়েছে মালদায়। প্রথম সেমিফাইনালে গাজোল ব্লক ০—০ গোলে রতুয়া ২ নম্বর ব্লককে হারিয়ে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লককে ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। গাজোল এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের মধ্যে ফাইনাল অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়াতে দু' পক্ষকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ফুটবল প্রতিযোগিতা ছাড়াও জেলা কর্তৃপক্ষ এই একই ভাবে স্তরে স্তরে সংগঠিত করেছেন জোনাল স্পোর্টস। অবহেলিত অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতার ফলে আসতে পেরেছে সকলের সামনে। ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা এ ব্যাপারে অকুণ্ঠ তারিফ পেয়েছেন সর্বস্তরের। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক বছরে কাজ এগিয়েছে সামান্যই। ক্রীড়া সংস্থার সবাই যদি কোমর বেঁধে এই কর্ম প্রচেষ্টাকে সফল করতে হাতে হাত মেলান তবে শুধু চাঁচোল, মাণিকচক, রতুয়া, কালিয়াচক, গাজোল এবং হাবিবপুরের যারা খেলাধূলা করতে চায় সেই অসংখ্য ছেলেমেয়েরাও উপকৃত হবে।

পূর্বাঞ্চল ভলিবল দর্শক টানতে পারেনি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সম্প্রতি ২১ বছরের কমবয়সী ছেলেদের দুদিন মেয়াদি পূর্বাঞ্চলীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল কলকাতায় রাজ্য ভলিবল সংস্থার কোর্টে। উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা ও আসাম এই পাঁচটি দলকে নিয়ে সরাসরি লিগ পর্যায়ের এই খেলায় প্রথম তিনটি দলের অর্জিত পয়েন্ট একই বিন্দুতে থমকে যায়। শেষ পর্যন্ত নিজেদের অনুকূলে একটি গেম বেশী থাকায় উত্তরপ্রদেশ টেক্কা মারে বাংলা ও বিহারকে। এধরনের প্রতিযোগিতা এই প্রথম হল। এ মাসে জয়পুর অথবা পার্তিয়ালায় চারটি জোন পরস্পরের মুখোমুখী হবে। আগামী এশিয়ান গেমসে ভাল ফল করার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এখান থেকেই একটি জুনিয়র ইণ্ডিয়া দল গড়া হবে,যারা এশিয়ান গেমসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোচিং ক্যাম্পে থাকবে।

উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল উদ্যোক্তা বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের ছেলেরা। দলগত শক্তির বিচারে দুদলের শক্তি ছিল প্রায় সমান। প্রথম গেমে ঝড়ের বেগে আক্রমণ, বাংলা বিপক্ষকে নাজেহাল করে ১৫—৫ গেম পায়। পরের গেমটিতে উত্তরপ্রদেশের ছেলেরা ১৫—৮ জিতে সমতা ফিরিয়ে আনে। এরপরের দুটি গেমে দারুণ লড়াই করে উত্তর-প্রদেশ গেম পয়েন্টের দোরগোড়ায় এগিয়ে যাওয়া বাংলাকে থমকে দিয়ে ১৬—১৪, ১৬—১৪-তে জিতে ম্যাচের ফয়সালা নিজেদের অনুকূলে টেনে নেয়। পরের ম্যাচে শক্তিশালী বিহারের কাছে ম্যাচ হাতছাড়া করতে বাধ্য হয় ৩—২ সেটে পিছিয়ে পড়ায়। এই ম্যাচটি ছিল সেরা। প্রায় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশকে দাবিয়ে বিহার ম্যাচ কব্জা করে। বিহারের জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল অধিনায়ক সুনীল তেওয়ারি, গৌতম ব্যানার্জি ও অমৃত পাল সিং। পরপর দুটি গেম ১৫—৪, ১৫—৮ এগিয়ে যাওয়া বিহার পরের দুটি গেমে জয় পেতে উদ্বুদ্ধ উত্তর-প্রদেশের মারমুখী আক্রমণের মুখে পুরোপুরি গুটিয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশ ১৫—৪, ১৫—৮-এ খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলে খেলা দারুণ জমে ওঠে। ম্যাচ নির্ধারক গেমে বিহার নিজেকে ফিরে পায় এবং ১৫—১০ পয়েন্টে গেম জেতার সূত্রে ম্যাচও জিতে যায়। এদিনই বিকেলে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে জিতে কিছুটা বাড়তি মনোবল নিয়ে মাঠে নামা বিহারকে ৩—১ গেমে হারিয়ে বাংলার ছেলেরা গত দিনে উত্তরপ্রদেশের কাছে হারের শোধ ওঠায়। এদিন বাংলার ছেলেদের ধারালো আক্রমণে বিহারের সমস্ত আক্রমণ ও প্রতিরোধ শক্তি ফালাফালা হয়ে যায়। প্রথম গেমটি খুব সহজেই ১৫—৪ জেতে বাংলা। দ্বিতীয় গেমে দলের আক্রমণের অন্যতম খুঁটি কমল ঘোষের বাঁহাতের কোড়ে আঙুল ভেঙে বাংলার কিছুটা কমজোরী হয়ে পড়ার ফায়দাকে কাজে লাগিয়ে ১৫—১০ গেম ছিনিয়ে বিহার কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার অবকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ গেমে বাংলা দাপটে খেলে বিহারকে কোণঠাসা করে দেয়। দম ফেলবাব ফুরসৎ না পেয়ে বিহার ১৫—৪ ১৫—৬ ম্যাচ হেরে যায়। দুর্বল প্রতিপক্ষ আসামের বিরুদ্ধে নিজেদের আক্রমণাত্মক খেলার ধারা বজায় রাখতে পারলে বাংলাই হয়ত চ্যাম্পিয়নশিপের তকমা নিজেদের দখলে রাখতে পারত। যদি আসামের বিরুদ্ধে বাংলা একটি সেট হাত ছাড়া না করত নিজেদের ঢিলেমির জন্য। যার জন্য ৪টি ম্যাচে অর্জিত মোট পয়েন্টে এগিয়ে

বাংলা ঃ ত্রিপুরা / শংকর





পূর্বাঞ্চল ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন উত্তরপ্রদেশ / শংকর

থাকায় বাংলা দ্বিতীয় হয় বিহারকে পিছনে ফেলে। ১৫—৮ প্রথম গেম পাবার পর বাংলার গা ছাড়া খেলার ফাঁকে আসাম ১৬—১৪ তে দ্বিতীয় গেমটি হাতিয়ে নেয়। এরপর বাংলার সংহার মূর্তির সামনে পরপর দুটি গেমে ১৫—১, ১৫—০ তে ধরাশায়ী হয় আসাম। আসাম একমাত্র অনভিজ্ঞ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতই সরাসরি জিতেছে। অবশ্য বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ঠাস বাঁধুনির আক্রমণের চাপে সরাসরি হেরেছে। ত্রিপুরা থেকে যে দলটি এসেছিল তা নবিসদের নিয়ে গড়া। যার ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেম খাওয়া ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না। আগামীতে অবশ্যই আরও ভাল খেলবে আশা করা যায়।

কেমন হল এই প্রতিযোগিতা? প্রথমত মণিপুর ও ওড়িশা আসবে জানালেও শেষ পর্যন্ত গরহাজির থাকায় প্রতিযোগিতাটি পরিপূর্ণ রূপ পায়নি। কেন আসেনি এর কোন সদুত্তর উদ্যোক্তাদেরও জানা নেই। অপর প্রতিযোগী-রাজ্য আসামের প্রথমে আসা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। আসাম খেলার দিন এসে হাজির হওয়ায় নতুন করে খেলার ফিকসচার তৈরি হয়। সেই সময়ে কলকাতার ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহিটে খেলতে নেমে ছেলেরা গরমে কাহিল হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগই নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা খেলোয়াড়দের প্রেরণার উৎস মাঠে উপস্থিত দর্শকেরা। ফুটবল-পাগল বাংলার লোকেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই ফুটবল মাঠ ছেড়ে ভলিবল কোর্টে হাজির হননি। অবশ্য উদ্যোক্তারা তেমন প্রচারেরও ব্যবস্থা করেননি। যার ফলে কোন সময়েই অনুষ্ঠানের জৌলুস ছিল না। বাইরের দলগুলিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এম এল এ হোস্টেলে। প্রত্যেকেই সহজাত বাংলার আতিথেয়তায় মুগ্ধ। প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ বহন করেছেন রাজ্যসংস্থা।



উত্তরপ্রদেশ ব্লক করে ফিরিয়ে দিল বাংলার স্ম্যাশ / শংকর

সুপ্ত বজ্রাসন

মনতোষ চৌধুরী

পদ্ধতি: প্রথমে হাঁটু গেড়ে অর্থাৎ নীল ডাউন হয়ে বসুন। তারপর পায়ের পাতার উপর পাছা চেপে বসে পড়ুন। এ সময় পায়ের পাতা দুটো ঠিক পাছার তলাতেই থাকবে। বুড়ো আঙুল দুটো পরস্পর ঠেকে থাকবে ও উভয় গোড়ালি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'পাছার পাশে লেগে থাকবে। পায়ের পাতার উপরের দিকটা একটু উল্টে গিয়ে মাটিতে ঠেকে থাকবে ও হাঁটু জোড়া থাকবে। এবার হাতের পাতা দুটো শরীরের দু' পাশে মেঝেতে রাখুন। তারপর শরীরটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাতের কনুই মেঝেতে রাখুন অর্থাৎ হাতের চেটো থেকে কনুই পর্যন্ত অংশ মাটিতে রাখুন। এবার খুব ধীরে ধীরে হাতের চেটো এবং কনুইয়ের ওপর শরীরের ভার রেখে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুটো শরীরের দু'পাশ দিয়ে তুলে মাথার উপর সোজাভাবে রাখুন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কনুই ধরুন এবং বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই ধরুন। এবার মাথা ও দুই কাঁধের অংশ মাটিতে রেখে বুক ও পেট যতটা সম্ভব উপরে তুলুন। এ সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন হাঁটু দুটো জোড়া থাকে এবং হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালির উল্টো দিকটা যেন মাটিতে ঠেকে থাকে ও পাছা যেন গোড়ালির সঙ্গে চেপে থাকে। এভাবে থাকার নাম সুপ্ত বজ্রাসন। এ আসন প্রথমে ২০ সেকেণ্ড করে অভ্যাস করবেন। ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে ১ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস করতে পারবেন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ আসনটি অভ্যাস করার পর অতি অবশ্যই শবাসন নেবেন।

উপকারিতা: এ আসন অভ্যাসে পায়ের গাঁট, হাঁটু, পাছা ও পায়ের ডিম ও উরুতে রক্ত চলাচল খুব বেশি হয় বলে এ সব জায়গায় কোন ব্যথা বা বাত হতে পারে না। যাদের একটু চলাফেরা করার পর পায়ে যন্ত্রণা হয় এবং পা কনকন করে, তারা এই আসন কয়েকদিন নিয়মিত অভ্যাস করলে সেই যন্ত্রণা ও কনকন ভাব, দুটোর হাত থেকেই নিস্তার পাবেন। এ আসনে মেরুদণ্ড নমনীয় থাকে এবং মেরুদণ্ডে রক্ত চলাচল খুব ভাল হয়। এ আসনে লাম্বেগো সারে। সায়টিকা সারে, শুয়ে পড়ার ফলে পেটের পেশীর উপর টান পড়ে বলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। গোড়ালি ও উরুতের মাংসপেশীগুলির স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে। প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড়েরই এ আসনটি বিশেষভাবে করা প্রয়োজন। কারণ তারা খেলার সময় উরু, হাঁটু, কোমরেও প্রায়ই ব্যথা পেয়ে থাকেন। তারা এ আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে সেই সমস্ত ব্যথা সেরে যাবে এবং কোমরের জোর বাড়বে ও পায়ের পেশীতে রক্ত চলাচল খুব ভালভাবে হয় বলে পায়ের পেশীগুলো পুষ্ট হবে।



মুর্শিদাবাদে মেয়েদের ফুটবল ও হ্যাণ্ডবল

গত ২১ ও ২২ মে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে মহিলা ফুটবল ও হ্যাণ্ডবলের দুটি প্রদর্শনী খেলা হয়। প্রথম দিন ফুটবলে বাংলা মহিলা একাদশ কলকাতা একাদশকে ২—০ গোলে হারায়। গোল দুটি করে সন্ধ্যা চক্রবর্তী ও শুক্লা দত্ত। দ্বিতীয় দিন বাংলা হ্যাণ্ডবল দলের সঙ্গে এণ্টালি এ সি'র খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ছোটদের ফুটবল কোচিং সেণ্টারের সাহায্যে ম্যাচ দুটির আয়োজন করেছিল ইলেভেন স্টারস অ্যাথলেটিক ক্লাব।



বাস্কেটবলে সবার সেরা হনুমান সিং

মিলন দত্ত

হনুমান সিংয়ের নাম এবারে বোম্বাইয়ের দর্শকদের মুখে মুখে। বাস্কেটবলের মত দলগত খেলায় একক খেলোয়াড় যে এতটা জনপ্রিয় হতে পারে তা অকল্পনীয়। ১৬ থেকে ২০ মে বোম্বাইয়ে চতুর্থ সর্বভারতীয় আন্তঃআঞ্চলিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় হনুমান সিংয়ের ক্রীড়া দক্ষতায় রাজস্থান গত তিনবারের বিজয়ী বিহারকে অতি সহজেই ১০৭-৬৭ পয়েন্টে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। প্রতিযোগিতার শেষে দর্শকদের ভোটের শতকরা ৯৮% ভাগ পেয়ে সেরা খেলোয়াড়ের বিশেষ পুরস্কার পেল হনুমান সিং। এছাড়া পায় একাধিক বিশেষ পুরস্কার। সব পুরস্কারেরই লক্ষ্য 'অর্জুন'প্রাপ্ত হনুমান সিং।

ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশন বাস্কেটবল খেলার প্রসার ও ব্যাপক উন্নতির জন্য সমগ্র দেশকে মোট চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রথমে আঞ্চলিক ভিত্তিতে এবং পরে প্রত্যেক অঞ্চল থেকে প্রথম দুটি করে দল নিয়ে এই আন্তঃআঞ্চলিক খেলার প্রবর্তন করেছেন। দিল্লিতে উত্তরাঞ্চলের খেলায় পাঞ্জাব ও দিল্লি, কটকে পূর্বাঞ্চল প্রতিযোগিতা থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, পণ্ডিচেরিতে দক্ষিণাঞ্চল প্রতিযোগিতা থেকে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র এই আন্তঃআঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে। বলা যেতে পারে জাতীয় স্তরের প্রায় সেরা রাজ্য দলগুলিকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা। সার্ভিসেস ও রেলওয়েজের খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ রাজ্যের পক্ষে খেলবার অধিকারী।

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান জিমখানার (মাতুঙ্গা) আলোক উদ্ভাসিত কংক্রিট কোর্টে এই প্রতিযোগিতাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য মহারাষ্ট্র রাজ্য বাস্কেটবল সংস্থার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করবার জন্য একটি সিগারেট প্রস্তুতকারক সংস্থা যেভাবে দরাজ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তা উল্লেখ্য। উদ্যোক্তারা আর একটি ব্যবস্থা করেছিলেন যা প্রতিটি দল ও খেলোয়াড় বিশেষ করে দলের কোচের কাছে বিশেষ মূল্যবান। প্রতিটি খেলার বিরতির সময় ও খেলার পরে উভয় দলের খেলোয়াড়দের বাস্কেট করতে বা রুখতে কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার একটি নির্ভুল সংখ্যাচিত্র কোচেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—যেটা পরবর্তী পদক্ষেপের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রতিযোগিতায় ৮টি দলকে দুটি ভাগে ভাগ করে লিগ প্রথায় খেলা সুরু হয়। 'ক' বিভাগে বিহার, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবকে রাখা হয়। পাঞ্জাব অনিবার্য কারণে অংশ নেয়নি। 'খ' বিভাগে পশ্চিমবঙ্গকে রাখা হয় রাজস্থান, কর্ণাটক ও দিল্লির সঙ্গে। বিভিন্ন বিভাগের ফল ঃ

'ক' বিভাগ	বিহার (১০১) মহারাষ্ট্র (৮২)
	তামিলনাড়ু (১০৮) মহারাষ্ট্র (৯৬)
	বিহার (১০৮) তামিলনাড়ু (৮৪)

এই বিভাগ থেকে বিহার ও তামিলনাড়ু সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে ওঠে।

'খ' বিভাগ	কর্ণাটক (৮৯) দিল্লি (৫৫)
	রাজস্থান (৭২) কর্ণাটক (৫৬)
	পশ্চিমবঙ্গ (৮৪) দিল্লি (৭৪)
	রাজস্থান (৯৮) পশ্চিমবঙ্গ (৫৭)
	রাজস্থান (১১৩) দিল্লি (৫২)
	কর্ণাটক (১১৬) পশ্চিমবঙ্গ (৬৯)

পূর্বাঞ্চলে এই প্রথমবার বিজয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বোম্বাইয়ের মূল প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় গতবারের রানার্স দিল্লির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৮৪-৭৪ পয়েন্টে পরাজিত করে। বিশ্রাম সময়ে ৩৫-৩৭ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে মূলত অধিনায়ক তারক সরকারের ক্রীড়া দক্ষতায় দ্বিতীয়ার্ধে প্রাণপণ লড়ে দিল্লিকে ১০ পয়েন্টের ব্যবধানে হারায়। এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তারক সরকার (৩৪) গৌতম গাঙ্গুলি (১৬) ইন্দ্রনাথ আঢ্য (১২) ও প্রদীপ তেওয়ারী (১১) পয়েন্ট অর্জন করেন।

অন্য দুটি খেলায় রাজস্থান ও কর্ণাটক সহজেই পশ্চিমবঙ্গকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা পায়। পশ্চিমবঙ্গ দলে অন্যান্য খেলোয়াড় ঃ অজয় কুণ্ডু, হরেরাম পাল, অঞ্জন চক্রবর্তী, শীতল সারেঙ্গী, অশোক গোস্বামী, নাজির আমেদ।

কোচ—রঞ্জন চ্যাটার্জি ও ম্যানেজার—বিনু চ্যাটার্জি।

প্রথম সেমি-ফাইনালে বিহার প্রথমার্ধে ৩৮—৪১ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কর্ণাটককে ৭০—৬১ পয়েন্টে হারায়। বিহারের পক্ষে সুনীল পাণ্ডা (২৬) কমলাকর (১৪) এবং ইরানী, সতীশ ও হরভজন প্রত্যেকে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। কর্ণাটকের পক্ষে অধিনায়ক শেলভাকুমার (২৭) সুরেশ (১০) রঙ্গদেব ও পাটাকর প্রত্যেকে ৮টি করে পয়েন্ট পান।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রাজস্থান মোটামুটি সহজ ভাবে খেলেই তামিলনাড়ুকে ৯৫—৭১ পয়েন্টে পরাজিত করে। বিশ্রাম সময়ে রাজস্থান ৬৩—৩০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। রাজস্থানের পক্ষে আজমের সিং (২৬) জোরওয়ার (২৪) হনুমান ও প্রতাপ প্রত্যেকে (১৪) পয়েন্ট করে এবং তামিলনাড়ুর পক্ষে মুরুলীনাথ (৩০) ও জয়বাল (১৬) পয়েন্ট সংগ্রহ করেন।

ফাইনাল খেলায় রাজস্থান সহজেই গত তিনবারের বিজয়ী বিহারকে ১০৭—৬৭ পয়েন্টে হারায়। বিশ্রাম সময়ে রাজস্থান ৫২—৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। এক তরফা খেলায় হনুমান সিংয়ের অপূর্ব ক্রীড়া চাতুর্যে বিহার দল মাঠে দাঁড়াতেই পারেনি। হনুমান সারাক্ষণ সতীর্থদের বল যুগিয়েছেন আর আজমের সিং (২৭) জোরওয়ার সিং (১৩) প্রত্যেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে তা কাজে লাগিয়েছেন। হনুমান নিজে ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন। অপরদিকে বিহারের বিজয় রাঘবনের অনুপস্থিতিতে সুনীল পাণ্ডাকে বল যোগাবার মত দলে আর কেউ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও সুনীল প্রায় একক প্রচেষ্টায় ৩২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। ফাইনাল খেলা পরিচালনা করেন ভি সন্মুখম (তামিলনাড়ু) ও এই লেখক।

এই প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকটি নতুন মুখের দেখা পাওয়া গিয়েছে, যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাল রেখে এই সব তরুণেরা আগামী দিনে কিরকম খেলে তাই লক্ষ্য করার। এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের আজমের সিং ও দীনেশ চতুর্বেদী, কর্ণাটকের দিলীপ ও পাটাকর, তামিলনাড়ুর জয়বাল, মহারাষ্ট্রের রিয়াজ আমেদ ও সৈয়দ বিজাপুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এশিয়ার ক্রীড়া মানচিত্রে হকি অ্যাথলেটিক্সের পর ভারতের যা কিছু মর্যাদা এই বাস্কেটবলেই। এশিয়ার প্রথম ৪/৫টি দলের মধ্যে ভারতের স্থান। অথচ ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন ও সরকারী ক্রীড়া দপ্তরের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রধান বলি এই বাস্কেটবল। যোগ্যতা সত্ত্বেও গত এশিয়ান গেমসে বাস্কেটবলে দল পাঠানোর অনুমতি পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে এই খেলার হাল বর্তমানে শোচনীয়। যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও সক্রিয় সংগঠনের অভাবে এই খেলা এগোতে পারছে না। পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় আজ অব্দি ময়দানে একটি পাকা সিমেন্টের বাস্কেটবল কোর্ট গড়ে উঠলো না, সবুজ ঘাস বাঁচানোর অজুহাতে। যদিও ময়দানের অনেক ক্রীড়া সংগঠনের বা ক্লাবের পাকা দালান উঠে গেছে। বাস্কেটবলে এই সুযোগ নেই, তাই অর্ধেক সময় খেলোয়াড়দের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

আর্থিক কারণে তরু অকালে ময়দান ছেড়েছিলেন



পাটনা থেকে সমীর সেনগুপ্ত : নিতান্ত অর্থকরী কারণেই একজন উঁচু মানের ফুটবলার যিনি জাতীয় স্তরে ওঠার মুখেই ময়দান থেকে বিদায় নিলেন—তিনি তরু গাঙ্গুলি। আসল নাম অবশ্য তরুণ।

১৯৫৪-৫৫ সালে সর্বপ্রথম সিনিয়র ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেয়ে স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড় তরু লিগের প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন, শিল্ডেও করেন। ফলে তিনি বিশেষ পরিচিত হয়ে পড়েন। তাকে নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেল ফুটবল রসিকদের মধ্যে। এর আগে কিশোর তরু গাঙ্গুলি ১৯৫২-৫৩ সালে মোহনবাগানের হয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন। কিন্তু স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে অপূর্ব খেলার পরেও দুই প্রধানের দলে তরু সুযোগ পেলেন না। সেই বছর এলো সেই দুর্ধর্ষ রাশিয়ান ফুটবল দল যাতে ছিলেন ইয়াসিন, নেট্টো, ইলিয়ান, ভাসাস্কিনের মতো খেলোয়াড়রা। রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবল দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড হয়ে খেললেন তরু গাঙ্গুলি হাজারিবাগ এবং বারাণসীর প্রদর্শনী খেলায়। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের খেলায় তিনি রিজার্ভে রইলেন।

পরের বছর চলে গেলেন বি এন আর-এ। সেখানে তখন নিয়মিত সেণ্টার ফরোয়ার্ড মেওয়ালাল। তাই দলে তরুকে রাইট আউট, লেফট আউট এমনাক রক্ষণভাগেও খেলতে হল। এর আগের বছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাকে ব্লু দেয় এবং ইস্টবেঙ্গল সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে তাকে ডুরাণ্ড খেলতে নিয়ে যায়।

বি এন আর-এ মেওয়ালাল ছাড়াও অমল দত্ত, ভারালু, তারাপদ রায়ের মতো নামজাদা খেলোয়াড়রা সে সময় ছিলেন।

আন্তঃরেল প্রতিযোগিতায় ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সাউথ ইস্টার্ন রেলের হয়ে খেলেছেন তরু গাঙ্গুলি। ১৯৫৮ সালে ওয়েস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে খেলা তরুর স্মরণীয় নৈপুণ্যের। খেলার শুরুতেই মেওয়ালাল আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়লেন। তখন দশজনে খেলতে হল সাউথ ইস্টার্নকে। কিন্তু দুর্ধর্ষ খেললেন তরু গাঙ্গুলি আর তার দেওয়া দু'গোলে সাউথ ইস্টার্ন সে ম্যাচ জিতল।

এরপর চাকরির জন্য তরু কলকাতা ছাড়েন। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দখল যায় আপ্পালারাজুর হাতে। সম্ভবত সেই বছরই আপ্পালা ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন।

এখনো সুগঠিত শরীর তরু গাঙ্গুলির মনে করিয়ে দেয় সেই ফেলে আসা অতীতের কথা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১, পরপর পাঁচ বছর বর্ধমান জেলার অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন। ক্রিকেটও খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। কিন্তু ফুটবল—তরু গাঙ্গুলি বললেন—এর কি তুলনা আছে! এ এক অদ্ভুত উন্মাদনার খেলা। তাইতো ১৯৬৫-তে এন আই এস-এর কোচের তালিম নিয়ে এলেন পাতিয়ালা থেকে।

চুয়াল্লিশ বছরের তরু গাঙ্গুলি এখনো একেবারে চাবুকের মত শরীরের অধিকারী! একটি মেডিকেল ফার্মের তিনি পাটনার সেলস অফিসার। ইচ্ছে ফুটবলার তৈরি করা। এখানে ছেলেদের মেধা আছে, আছে অদম্য উৎসাহ আর সেই সঙ্গে নব্বই মিনিটের ফুটবল খেলার উপযোগী স্বাস্থ্য। তবে ভাই—হেসে বললেন তরু গাঙ্গুলি, নিজেদের মধ্যে এত কোন্দল থাকলে তো মুস্কিল।



রাজনীতির বলি : এই সেই দক্ষিণ কোরীয় টেবল টেনিস দল—যারা এবার উত্তর কোরিয়ার পিয়াং ইয়াং-এ ৩৫তম বিশ্ব টেবল টেনিসে খেলার অনুমতি পায়নি—উত্তর কোরিয়ার দাবি (সম্মিলিত কোরিয়া নামে খেলতে হবে) মানতে রাজি না হওয়ায়। সিউল থেকে পিয়াং ইয়াং-এর দূরত্ব সামান্য। তবুও জেনিভা হয়ে যাওয়া যায় কিনা সেজন্য দলটি জেনিভা পর্যন্তও গিয়েছিল। ফল হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের আবেদন সত্বেও। রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখল খেলাকে। অথচ ১৯৭৩-এ যুগোশ্লাভিয়ার সারা জেভোয় দক্ষিণ কোরিয়ার মেয়েরা ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, কলকাতায় ১৯৭৫-এ হয় রানার্স।

ইংল্যাণ্ডে ভারতের জয় যত হার তার আঠারো গুণ

বিপ্লব রায় ঃ ইংল্যাণ্ডে খেলতে যাওয়া মানেই হারা, এই শতাব্দীর মাঝের চল্লিশটা বছর জুড়ে ভারতীয় ক্রিকেটের পরিমণ্ডলে আর কোনো কথা খুঁজে পাওয়া যায়নি বোধহয়।

১৯৩২-এ লর্ডসে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলা দিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রবেশের পর থেকে সাতষট্টিতে ষষ্ঠ ইংল্যাণ্ড সফর পর্যন্ত হার আর ড্র ছাড়া ভারতের কিছুই জোটেনি। একাত্তরে অজিত ওয়াড়েকারের দলও লর্ডস এবং ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের প্রথম দুটি টেস্ট ড্র করে। ওভালের শেষ টেস্টে ৪ উইকেটে জিতে যায় ভারত। ইংল্যাণ্ডের মাঠে সেটি ছিল ভারতের বাইশতম টেস্ট।

হার আর ড্র-এর ট্র্যাডিশনেও যে ছেদ টেনে দিতে পারি আমরা, এই স্বপ্ন মধুর চিন্তা পরের তিনটি বছর আঁকড়ে ছিল আমাদের। চুয়াত্তরের শেষ ইংল্যাণ্ড সফর যেন সেই সোনাঝরা দিনগুলির স্মৃতি ধুয়ে-মুছে নিয়ে গেছে। তিন টেস্টের সিরিজে ওয়াড়েকারের দল হেরে যায় শোচনীয়ভাবে। তার চেয়েও বড় কথা যে জঘন্যতম ঘটনা সমষ্টি ছড়িয়ে আছে এই সফরে, তা কোনোদিন ভোলা যাবে না। সুধীর নায়েকের মোজা চুরির দায়ে ধরা পড়া এবং কোর্টে হাজির হওয়া, ভারতীয় হাইকমিশনারেন প্রদত্ত পার্টিতে গোটা দলটির দেরিতে পৌঁছানো ও হাইকমিশনারের তীক্ষ্ণ মন্তব্য, লর্ডসে ৪২ রানে ইনিংস শেষ করার পর ওদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ঠাসা চিঠির স্রোত সেই সঙ্গে দলের মধ্যে অসন্তোষ, দেশে ফেরার পর বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের বোর্ডের 'স্পেশ্যাল কমিটির' সামনে হাজির, কিছুই বাদ যায়নি।

ইংল্যাণ্ডের মাঠে হারা ভারতের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ৪২ রানে ইনিংস শেষ করে ভারত সেদিন হতভম্ব করে দিয়েছিল দুনিয়াকে।



জীবনে একবারই মাত্র অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছিলেন পঙ্কজ রায়



১৯৭১-এর সিরিজে রাবার বিজয়ী ভারতের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকার

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে হতভম্ব করে দেওয়া ঘটনা অবশ্য আগেও ঘটেছে কিন্তু এমনটি আর হয়নি। ১৯৩২-এ টেস্ট আঙিনায় পদার্পণের কালে ভারতের প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে সরকারীভাবে পোরবন্দরের মহারাজ নাটোর সিংজীকে অধিনায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লর্ডসের এক আর একমাত্র টেস্টে দলে তার জায়গাই হয়নি। সি কে নাইডু হয়েছিলেন ভারতের দলপতি। পৃষ্ঠপোষকতার আড়ালে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে রাজরাজড়াদের আধিপত্য বড় হয়ে উঠেছিল সেই লগ্নে। উত্তরকালে রাজা-রাজড়া কি নবাব ও নবাবজাদাদের প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুর্বলতাও প্রকট হয়ে পড়েছিল বড় বিশ্রীভাবে।

১৯৩২-এর সেই প্রথম টেস্টে ১৫৮ রানে হেরে যায় ভারত। মহম্মদ নিসার, অমর সিং, জাহাঙ্গীর খান-এর মত জাত ফাস্ট বোলার-দের উপস্থিতি ভারতকে লড়াই করবার মত রশদের সন্ধান দিয়েছিল। জানা গিয়েছিল টেস্টে নবাগত হলেও ভারত সামর্থে নাবালক নয়। ১৯৩৬ ও ৪৬-এ পরের দুটি সফরেও টেস্ট ম্যাচের মেয়াদ ছিল তিনদিনের। তবে সংখ্যায় বেশি, তিনটি করে।

লড়াই কতটুকু করতে পেরেছিল ভারত সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। যেহেতু জেতা হয়নি কোনটিতেই। তবে দুবারই দলে নির্বাচিত হয়েও সুঁটে ব্যানার্জিকে একবারও টেস্ট খেলতে ডাকা হয়নি। ক্রিকেট বোর্ড ও তার তল্পিবাহক মাতব্বরদের কাণ্ড তাই আজও কুবিচারের নামাবলী জড়িয়ে পড়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। ঘরোয়া ক্রিকেটে সুঁটের অসাধারণ ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব না হওয়ায় টেস্ট দলে তাকে ঠাঁই দিতেই হয়েছিল। বাইরে গিয়ে কলকাঠি নাড়া হয় যথারীতি। অগত্যাই……।

তবু কি মধ্য চল্লিশেও ভারতীয় ক্রিকেটের এই যুগন্ধর চরিত্রটিকে আড়াল করে রাখতে পেরেছিলেন ভারতীর ক্রিকেটের তৎকালীন প্রশাসককুল? ১৯৪৬-এ ওভালে সারের সঙ্গে ম্যাচে সুঁটে ১২১ রান করে বসেন। এগারো নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে পাঠানো হয়েছিল তাকে। সুঁটের সঙ্গী দশ নম্বর ব্যাটসম্যান চান্দু সারওয়াতেও সেঞ্চুরি করেছিলেন সেই ইনিংসে—১২৪। প্রথম শ্রেণীর কোনো ম্যাচে একই

ইনিংসে দশ ও এগারো নম্বর ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির দৃষ্টান্ত আর নেই। ক্রিকেটের বর্ষপঞ্জী 'উইসডেন' তাই আলাদা করে রেখেছে ওই ঘটনাটিকে।

১৯৫২-র চতুর্থ ইংল্যাণ্ড সফরে চার টেস্টের সিরিজে ৩-০ ম্যাচে হারে ভারত। পিটার মে, লেন হাটন, সিম্পসন, ডেভিড শেপার্ড ও গডফ্রে ইভান্সের মত ব্যাটসম্যান আর ট্রুম্যান, লেকার, বেডসারের মত বোলার ছিলেন সেবার ইংল্যাণ্ড দলে। মানকর, হাজারে, ফাদকার, মঞ্জেরেকার, গোলাম আমেদের ভারতের পক্ষে স্বভাবতই সমানভাবে তাল ঠোকা সম্ভব হয়নি সেবার। যদিও মাস কয়েক আগে স্বদেশে ইংল্যাণ্ডকে টেস্ট ম্যাচে প্রথম হারানোর কৃতিত্ব এসে গিয়েছিল ভারতের মুঠোয়।

জয় মেলেনি ভারতের, কিন্তু বাহান্নর সফরে হাজারে ও মানকড় এবং বিচ্ছিন্নভাবে মঞ্জরেকারের ব্যাটিং এত বছর পরেও যেন সমান ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ভাসছে চোখের সামনে। লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্ট বিনু মানকড়ের নামে চিহ্নিত হয়ে গেছে। প্রথম ইনিংসে ৭২, দ্বিতীয় দফায় ১৮৪ রান এবং ১৯৬ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট দখল—বিনুকে অনন্তকাল স্মরণীয় করে রাখবে।

১৯৫৯-এর সফরে ০-৫ ম্যাচে হেরেছিল ভারত। আর কিছু হওয়া সম্ভবও ছিলনা বোধহয়। যে অপরিমিত সামর্থ ছিল, ব্যারিংটন, পুলার, পিটার মে ও কলিন কাউড্রের ব্যাটে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত ব্যাটসম্যান কি বোলার কিছুই ছিলনা সেবারের ভারতীয় দলে। বিচ্ছিন্নভাবে ভাল খেলেছিলেন হয়ত কেউ কেউ। কিন্তু তম্বারা লড়াই বাধিয়ে তোলা সম্ভব ছিলনা। লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে পঙ্কজ রায় ভারতের অধিনায়ক হন সেবার। এবং জীবনে ওই একবারই।

ইংল্যাণ্ডের জল হাওয়ায় ভাল খেলা আগেও যেমন সম্ভব হয়নি ১৯৬৭-র সফরেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনটি টেস্টেই হারে ভারত। তবে লিডসের প্রথম টেস্টে ফলো-অন করে দ্বিতীয় দফায় ৫১০ রান করবে ভারত,এ বোধহয় কেউ ভাবেনি। মনসুর আলি খান পতৌদির ১৪৮, রানের পাশাপাশি ওয়াড়েকার, এঞ্জিনিয়ার, হনুমন্ত সিং-এর কথাও এসে পড়বে। অল্প রানের জন্য সেঞ্চুরি পাননি ওরা কিন্তু যে ব্যাটিং করেছিলেন হয়ত সহজে ভোলা যাবে না।

সত্তরের দশকের শুরুতে ভারতীয় ক্রিকেটে যে 'নবজাগরণের' ঢেউ এসেছিল ১৯৭১-এর ইংল্যাণ্ড সফর তার এক প্রমাণ। ইংল্যাণ্ডকে তার দেশের মাটিতেই হারিয়ে সেই প্রথম রাবার জেতে ভারত—তিন টেস্টের সিরিজে ১—০ ম্যাচ জিতে। লর্ডস এবং ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের প্রথম দুটি টেস্ট ড্র হয়ে যাবার পর ওভালের শেষ টেস্টে ৪ উইকেটে জেতে ভারত। যৌথ কৃতিত্ব যে তা অনস্বীকার্য। তবু আলাদা করে চন্দ্রশেখরের কথা বলতেই হয়। ১০১ রানে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস খতম হয়ে যায় মূলত তারই জন্য। ৩৮ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন সেদিন চন্দ্র।



ছবি: রঞ্জন প্রামানিক





চুয়াত্তরের শেষ সফরের কাহিনী তো আগেই বলা। নোংরামি, অভব্যতা, অসন্তোষ, দলবাজির পরিণতি ব্যর্থতা ছাড়া আর কি হতে পারে? ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম টেস্টে ১১৩ রানে হারলেও লর্ডস ও এজবাস্টনে পরের দুটি টেস্টে ইনিংসে হারের মধ্যে দিয়ে তলিয়ে যায় ভারত। বিক্ষিপ্তভাবে গাভাসকর, বিশ্বনাথ, এঞ্জিনিয়ার এবং একবার আবিদ আলিও ব্যাট হাতে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।

এতসব কাহিনী, ঘটনা আর পরিসংখ্যান পিছনে রেখে ভারতের নবম ইংল্যাণ্ড সফর শুরু ২৭ জুন। কি যে ঘটবে এখনই তার ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। ইংল্যাণ্ড সফরে চিরকালের ট্র্যাডিশনে ছেদ টেনে দেওয়া গিয়েছিল এই দশকেই। হোকনা তা একবারের জন্য।

ইংল্যাণ্ডের মাঠে ভারত

আগের ৮টি সিরিজের ফল

	খেলা	ড্র	ভারতের জয়	ইংল্যাণ্ডের জয়
১৯৩২	১	—	—	১
১৯৩৬	৩	১	—	২
১৯৪৬	৩	২	—	১
১৯৫২	৪	১	—	৩
১৯৫৯	৫	—	—	৫
১৯৬৭	৩	—	—	৩
১৯৭১	৩	২	১	—
১৯৭৪	৩	—	—	৩
মোট :	২৫	৬	১	১৮

ইংল্যাণ্ডের মাঠে ২৫ ও স্বদেশে ২৮, মোট ৫৩টি টেস্ট খেলেছে ভারত এ পর্যন্ত। উইকেট জুটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ রানের পরিসংখ্যান এখন এইরকম—

১ম উইঃ	বিনু মানকড় ও মুস্তাক আলি	২০৩	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
২য় উইঃ	এঞ্জিনিয়ার ও ওয়াড়েকর	১৯২	বোম্বাই	১৯৭২-৭৩
৩য় উইঃ	বিজয় মার্চেন্ট ও হাজারে এবং	২১১	দিল্লি	১৯৫১-৫২
	বিনু মানকড় ও হাজারে	২১১	লর্ডস	১৯৫২
৪র্থ উইঃ	বিজয় হাজারে ও মঞ্জরেকার	২২২	লিডস	১৯৫২
৫ম উইঃ	মনসুর আলি খান ও বোরদে	১৯০	দিল্লি	১৯৬৪
৬ষ্ঠ উইঃ	হাজারে ও দাত্তু ফাদকার	১০৫	লিডস	১৯৫২
৭ম উইঃ	বোরদে ও দুরানী	১৫৩	বোম্বাই	১৯৬৪
৮ম উইঃ	নাদকার্নি ও এঞ্জিনিয়ার	১০১	মাদ্রাজ	৬১-৬২
৯ম উইঃ	রামচাঁদ ও এস সিন্ধে	৫৪	লর্ডস	১৯৫২





অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘবন — চন্দ্রশেখর

১০ম উইঃ	নাদকার্নি ও চন্দ্রশেখর	৫১	কলকাতা	১৯৬৪

সর্বোচ্চ রান :

ইংল্যাণ্ডে ভারতের	৫১০	লিডস	১৯৬৭
ইংল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের	৬২৯	লর্ডস	১৯৭৪
ভারতে ইংল্যাণ্ডের ৮ উইঃ ডিক্লেয়ার	৫৫৯	কানপুর	১৯৬৪
ভারতে ভারতের ৯ উইঃ ডিক্লেয়ার	৪৮৫	বোম্বাই	৫১-৫২

সর্বনিম্ন রান :

ভারতে	ইংল্যাণ্ডের	১৫৯	মাদ্রাজ	১৯৭৩
ভারতে	ভারতের	৮৩	মাদ্রাজ	১৯৭৬-৭৭
ইংল্যাণ্ডে	ভারতের	৪২	লর্ডস	১৯৭৪
ইংল্যাণ্ডে	ইংল্যাণ্ডের	১০১	ওভাল	১৯৭১

এক সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে	ডেরেক আণ্ডারউড	২৯টি	ভারতে	৭৬-৭৭
	ফ্রেড ট্রুম্যান	২৯টি	ইংল্যাণ্ড	১৯৫২
ভারতের পক্ষে	চন্দ্রশেখর	৩৫টি	ভারত	১৯৭২-৭৩
	সুভাষ গুপ্তে	১৭টি	ইংল্যাণ্ড	১৯৫৯

এক সিরিজে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত মোট রান

ভারতের পক্ষে	বিজয় মঞ্জরেকার	৫৮৬	১৯৬১-৬২
ইংল্যাণ্ডের পক্ষে	কেন ব্যারিংটন	৫১৪	১৯৬১-৬২

ইংল্যাণ্ডের মাঠে হয়ে যাওয়া পাঁচশটি টেস্ট ম্যাচে অগুন্তি ঘটনা ছড়িয়ে আছে। ১৯৫২-র ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের তৃতীয় দিনে ৫৮ ও ৮২ রান করে ভারতের দুটি ইনিংস এক দিনেই খতম হয়ে যায়। টেস্ট ক্রিকেটে এই নজীর অবশ্য অভূতপূর্ব নয়। আরও ৫৮ বছর আগে ইংল্যাণ্ড—অস্ট্রেলিয়ার সিডনি টেস্টে ৬৫ ও ৭২ রানে ইংল্যাণ্ডের দুটি ইনিংস একদিনেই খতম হয়ে গিয়েছিল।

ওই ১৯৫২-র টেস্ট সিরিজেই চারটি টেস্টের সাতটি ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে পঙ্কজ রায় পাঁচবারই শূন্য করেছিলেন। যা এক অর্থে বিশ্বরেকর্ডও বটে। শেষ চারটি ইনিংসের কোনটিতেই তিনি রান পাননি। অবশ্য পঙ্কজ রায়ের আগে ও পরে আরও দুজন এই নজীর তৈরি করেছেন। ১৮৯৪-৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের আর পীল এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে এল মিলার পরপর চারটি ইনিংসে শূন্য করেন।

১৯৫৯-এর ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে মাত্র ২০ বছর ৪ মাস ১১ দিন বয়সে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই আব্বাস আলি বেগ সেঞ্চুরি করেছিলেন। ভারতের পক্ষে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির দৃষ্টান্ত এটি। আবার ১৯৩৬-এ ওই ম্যাঞ্চেস্টারেই ভারতের সি রামস্বামী তার জীবনে প্রথম টেস্ট খেলেন। সেদিন তার বয়স ছিল ৪০ বছর এক মাস ছয় দিন। বিদেশের মাঠে এত বেশী বয়সে ভারতের হয়ে টেস্টে আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত আর নেই।

১৯৫২-র সিরিজে লিডসের প্রথম টেস্ট ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে কোন রান পাবার আগেই ভারত চারটি উইকেটে হারায়। পঙ্কজ রায়, ডি কে গাইকোয়াড়, মঞ্জরেকার এবং মাধব মন্ত্রী কোন রানই করতে পারেননি। টেস্ট ইতিহাসে এই ঘটনা চিহ্নিত হয়ে আছে 'জঘন্যতম শূন্য' আখ্যায়।

১৯৪৬-এর সিরিজে ওভালের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের ডেনিস কম্পটন এক বিচিত্র উপায়ে ভারতের বিজয় মার্চেণ্টকে রান আউট করে দিয়েছিলেন যা ইতিহাসে এক আর একমাত্র নজীর হয়ে আছে। মার্চেণ্টের সতীর্থ ওপেনার বিনু মানকড় শর্ট লেগে দাঁড়িয়ে থাকা কম্পটনের অনেক দূর দিয়ে বল ঠেলে এক রান নিতে গিয়েছিলেন। ফুটবলার ক্রিকেটার কম্পটনের পক্ষে দৌড়ে গিয়ে হাতে করে বল ধরে ছোঁড়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি বাঁ পায়ে এক কিক করে বসেন বলে। মার্চেণ্ট ক্রিজে পৌঁছবার আগেই বল স্টাম্প ছিটকে দেয়। মার্চেণ্টের রান ছিল ১২৮।

বলো দেখি

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১। বর্শা হাতে মারে ছুঁড়ে
প্রথম তিনশ ফিট দূরে —কে ?

২। একই দিনে এক এক করে
ছয়টি বিশ্ব রেকর্ড ধরে —কে ?

৩। প্রজাপতি ফুলে ফুলে ওড়ে
মুখেতেও থাকে মাঝে মাঝে
বলো দেখি জলের মাঝারে
প্রজাপতি আসে কোন কাজে ?

৪। ইংলিশ চ্যানেলের এপার ওপার
ডুবে ডুবে পার হয় প্রথম সবার
—কে ?

৫। বলো দেখি কোন বছরে
বল্ধ ট্রফি শুরু করে ?



উত্তর

১। টের্জে পেডারসন (নরওয়ে) Terje Pederson।
২। জে সি ওয়েনস। ৩। বাটার ফ্লাই স্ট্রোক সাঁতারে।
৪। ফ্রেড ব্যাল্ডেশেয়ার (ইউ এস এ) Fred Baldesare।
৫। ১৯০৪ সালে।

যেমনই দক্ষ খেলোয়াড়, তেমনই সুদক্ষ ব্যাঙ্ক-কর্মী !

স্টেট ব্যাঙ্কের আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, কোনোরকম খেলাধুলা ছাড়া শুধু কাজ করে গেলে জীবনে একঘেয়েমি এসে যায়। সেইকারণেই আমরা বিগত বছরগুলিতে আমাদের কর্মীদের এই খেলাধুলার ব্যাপারে উৎসাহিত করে এসেছি এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য সানন্দে অনুমতিও দিয়েছি।

এছাড়া আমরা 'পেস বোলার' শিক্ষার্থীদের জন্য বম্বে এবং পুণেতে অভিজ্ঞ কোচের তত্বাবধানে বিশেষ 'কোচিং সেণ্টার' খুলেছি। আর আমাদের এই উৎসাহদানের সুফলও আমরা পেয়েছি। তাই আজ আমরা দেশকে যে শুধু দক্ষ খেলোয়াড়ই দিয়েছি তাই নয়, সেইসঙ্গে নিজেদের মধ্যে সুদক্ষ ব্যাঙ্ক-কর্মীদেরও পেয়েছি।



উঠছে যারা

নতুন বিভাগ, ১৪ বছরের কম বয়সীরাই এই বিভাগে লিখবে, আঁকবে। তবে ঠিক হয়েছে —— অংশগ্রহণকারী সকলকে বিদ্যালয়ের প্রধানকে দিয়ে আঁকা ও লেখার সঙ্গে বয়সের সার্টিফিকেট পাঠাতে হবে। —সম্পাদক



খেলাটি খুব ভাল লেগেছিল

আমি এবছর ২৯.৫.৭৯ তারিখে মোহনবাগান বনাম উয়াড়ির খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। এটি আমার প্রথম মাঠে গিয়ে খেলা দেখা। আমি আমার দাদার সঙ্গে গেছিলাম। মাঠে এত ভিড় যে সাধারণ খেলায় হয়, তা আমি চিন্তাও করতে পারিনি। চারদিকে নানারকম লোক, হকার, পুলিশ দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। যাই হোক সাড়ে তিনটার সময় মাঠে ঢুকে দেখলাম জনসমুদ্র। যেন সারা কলকাতার লোক খেলা দেখতে গেছিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে খুবই কষ্ট হয়েছিল, কারণ সমস্ত লোক এমন বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়েছিল যে দাঁড়াতে খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং বারবার মাউন্টেড পুলিশ আসছে তখন ঠিকভাবে দাঁড়াচ্ছে এবং চলে যেতেই যে কে সেই। এছাড়া আরেকটা কষ্ট হল যে প্রচণ্ড জল তেষ্টা পেলেও কিছুই করার নেই, কারণ আইসক্রীমওলাও বিশেষ নেই। যাই হোক, খেলা শুরু হতেই একজন দু'জন করে সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে পড়ল। এই খেলাটিতে প্রথমার্ধে'ই মোহনবাগান দু গোলে এগিয়ে গেল। আগের খেলার থেকে মোহনবাগান এই খেলায় অনেক ভাল খেলেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে কারণ মোহনবাগান খুব একটা গা লাগিয়ে খেলছিল না, কিন্তু তাও দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করে মোহনবাগান নিশ্চিতভাবে জয় পেল। চারদিকের আবহাওয়া, প্রথম ঘেরা মাঠে খেলা দেখা, সব মিলিয়ে খেলাটি আমার খুবই ভাল লেগেছিল।

ঃ খেলার ফল ঃ

মোহনবাগান—৩ উয়াড়ি—০
(মানস ভট্টাচার্য,
তপন দাস-২)

দেবজ্যোতি চৌধুরী (১৩)

একটি অনুরোধ

প্রিয় সম্পাদক,

খেলার আসরে পড়ি পি কে ব্যানার্জি অনেক বড় খেলোয়াড় ছিলেন, চুনী গোস্বামী বড় খেলোয়াড় ছিলেন। এইরকম বলরামও। শৈলেন মান্না, মেওয়ালাল ধনরাজরা নাকি আরও বড় ছিলেন। কিন্তু আমরা তো ওদের খেলা দেখিনি। কি করে বুঝবো ওরা সুন্দর শট করতেন, কাটাতেন, গোল করতেন। আচ্ছা ওরা কি অল্প সময়ের জন্য মাঠে নামতে পারেন না? যাতে আমরা একটু দেখতে পারি?

অঞ্জন ভদ্র (১৪) ঢাকুরিয়া



বল খেলা ভাল লাগে
মাঠে যাই খেলতে
বাবা, মা ছুটে আসে
পিঠে তুলো ধুনতে।

অরিজিৎ সাহা (১২)



রবারের বলটায়
মারলো জোরে লাথি
গোল পোস্টে যাবার আগে
বল হয়ে গেল হাতি।

অতনু ঘোষ (১৩)

কারা ভাল খেলছে

'খেলার আসরে' প্রায়ই দেখি বাংলার বাইরের থেকে কলকাতায় এবার খেলোয়াড় আসায় কেউ বলছেন, 'বেশি টাকা দিয়ে ওদের আনা ঠিক কাজ হয়নি। এতে বাংলার ছেলেরা বঞ্চিত হবে।' কেউ আবার বলছেন, 'বাইরের প্লেয়ার তো এই নতুন আসছে না। আগেও বহু এসেছেন। বাইরের কেউ এলে তবে তো বোঝা যাবে—বাংলার প্লেয়ারদের মান কেমন। এতে কম্পিটিশন বাড়বে।' কেউ বলেছেন, 'ফুটবলে বাংলা ভারতের সেরা। বাইরের এনে লাভ কি?'

ওরা সত্যি সত্যি খেলছে কেমন—তা দেখতে হাজির হয়েছিলাম কয়েকদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে ছোটকাকুর সঙ্গে। আমার মনে হল খেলার আসরের পাঠকরা কেউই ঠিক লেখেননি। কেননা, দেখলাম অন্য রাজ্যের তারকা মনজিত, গুরদেব যেমন খেলতে পারছে না, তেমনি বাংলার অনেকেই খারাপ খেলছেন। আবার বাইরের সাবির আলি যেমন সুন্দর খেলছেন, তেমনি এখানকার সুরজিত, মনোরঞ্জনরাও চমৎকার। সুতরাং বাইরের প্লেয়ার হলেই খুব ভাল, আর এখানকার প্লেয়ার হলে খারাপ—একথা বলা উচিত নয়।

আবার দেখুন মোহনবাগানে জেভিয়ার পায়াস তো দুর্দান্ত খেলছেন। মহমেডান স্পোর্টিং-এ নাজীবও বেশ খেলছেন।

সুতরাং বাইরের বা স্থানীয় এমন বলা হচ্ছে কেন?

সুমিত দেব রায় (১৪)

লিগের অন্য খেলা, গড়াপেটা শুরু

এরিয়ান—২ কাস্টমস—০
(কাশী পাল, দেবাশিস রায়)

৭ জুন ঃ এর আগের ম্যাচে জর্জের কাছে একটি পয়েন্ট হাতছাড়া করার পর এরিয়ান তাদের নবম ম্যাচে শক্তির নিরিখে কমজোরী নবাগত কাস্টমসকে পরিষ্কার ২—০ গোলে হারিয়েছে বিশেষ গা না ঘামিয়ে। প্রতিপক্ষ কাস্টমস কোন সময়েই শক্ত সমর্থ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে এরিয়ানের প্রবল আক্রমণের চাপে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট করার ফলে এরিয়ান প্রথম গোল পায় প্রথম হাফের ২২ মিনিটে। শংকর অধিকারীর পাস আয়ত্তে এনে কাশী পাল দুরন্ত সটে কাস্টমস জালে বল পাঠায়। এরপর এরিয়ানের গা-ছাড়া খেলার ফাঁকে কাস্টমস কিছুটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিপক্ষ রক্ষণের শক্ত বাঁধুনির ফাঁস আলগা করতে না পারায় বিশেষ লাভ হয়নি। বিরতির পরও প্রাধান্য ছিল এরিয়ানের দখলে। তবে গোলের দিকে ওদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। খেলা শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে বিশ্বজিত ভট্টাচার্য ফাঁকায় দাঁড়ানো দেবাশিসকে লক্ষ্য করে বল পাঠায় এবং তা থেকে দেবাশিসের মাটি কামড়ানো সট দ্বিতীয়বার কাস্টমস গোলরক্ষককে বোকা বানায়। আটটি ম্যাচে আট পয়েন্ট হয়েছে কাস্টমসের। অন্যদিকে ৯টি খেলায় ৬টি জিতে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে এরিয়ান এবছর লিগ কোঠার চতুর্থ স্থান দখলের জন্য জোর লড়াই বাধাবে।

উয়াড়ি—১ জর্জ টেলিগ্রাফ—০
(উত্তম চক্রবর্তী)

প্রথম ম্যাচে পোর্ট ট্রাস্টকে বড় ব্যবধানে হারাবার পর উয়াড়ি কিছুতেই নিজেদের ফাইটিং স্পিরিট খুঁজে পাচ্ছিল না। এদিন 'বড় দরের' টিম জর্জ টেলিগ্রাফকে ১—০ হারিয়ে নিজেদের ফিরে পেয়েছে। ছন্নছাড়া জর্জ টেলিগ্রাফের এলোমেলো খেলার পুরো ফল তুলে উয়াড়ি প্রবল প্রতিপক্ষের ভূমিকা নিয়ে বারবার বিপক্ষ রক্ষণকে নাকাল করেছে সুন্দর বোঝাপড়ার মধ্যে খেলে। কিন্তু ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায় উয়াড়ি একটির বেশী গোল পায়নি। অবশ্য জর্জের গোলকিপার বিশ্বজিৎ বেশ কয়েকবার দলের পতন রোধ করেছে। প্রথম পর্বের দশ মিনিটের মাথায় নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করে এগিয়ে এসে উয়াড়ির রাইট স্ট্রাইকার জর্জ রক্ষণকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসা বিপক্ষ গোলকিপারকে পাস কাটিয়ে বিজয়ী দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করে। উয়াড়ি ৯টি খেলায় আট পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। আটটি ম্যাচে দ্বিতীয়বার আছাড় খেয়ে জর্জের হয়েছে আট পয়েন্ট।

সালকিয়া ফ্রেণ্ডস—২ পুলিশ—১
(রবীন মণ্ডল,
শিবব্রত নাথ) (কৃশানু দে)

৮ জুন ঃ প্রথম দফায় দুপক্ষই পাল্লা দিয়ে লড়েও গোল করতে পারেনি। বিরতির পর ২০ মিনিট পর্যন্ত সারামাঠ জুড়ে গুছিয়ে ফুটবল খেলার ফাঁকে সালকিয়া পরপর দুটি গোল করে এগিয়ে যায়। ঐদিন সালকিয়া আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল অসিত ঘোষের বদলে মাঠে নামা অভিজ্ঞ জহর দাস। গোল দুটির সুযোগও জহরেরই তৈরি। ৬ মিনিটে বিপক্ষ ডিফেন্স চিরে রবীনের উদ্দেশ্যে জহর নিখুঁত বল পাঠায় এবং তৎপরতার সঙ্গে বল পুলিশ জালে চালান করে দেয়। এর মিনিট সাতেকের মধ্যেই দ্বিতীয় গোলটি করে শিবব্রত নাথ। এক্ষেত্রেও বলটি শিবব্রতকে বাড়িয়ে ছিল জহর। দুটি গোল খেয়ে পুলিশ মরীয়া হয়ে বিপক্ষ সীমানায় হানা দেয় এবং খেলা শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে পুলিশের পক্ষে পরিবর্ত খেলোয়াড় কৃশানু দে একটি গোল করে ব্যবধান কিছুটা কমায়। ৮টি ও ৭টি ম্যাচ খেলে সালকিয়া এবং পুলিশের পয়েন্ট যথাক্রমে ১০ ও ৩। পুলিশ এখনও জয়ের মুখ দেখেনি। আগামীতে ভাল ফল না করতে পারলে অবনমনের খাঁড়ার ঘা থেকে নিজেদের বাঁচাতে মুস্কিলে পড়ে যাবে।

খিদিরপুর—০ বি এন আর—০

খেলার ধারা অনুযায়ী খিদিরপুরের এদিন অন্তত দু'গোলে জয় পাওয়া উচিত ছিল। দুটি সুযোগই পেয়েছিল দলনায়ক অমিত বাগচী। প্রথমবার অমিতের জোরালো ড্রাইভ অন্য সকলকে ধোঁকা দিলেও বি এন আরের লাস্ট ডিফেন্স গোল পোস্টের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। পরেরটি গোল হয়নি বি এন আরের গোলকিপার অমর সিংয়ের তৎপরতায়। এক্ষেত্রে অমিতের সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিকটি গোলে ঢোকার মুখে অমর ফিস্ট করে গতিপথ বদলে দেয়। এরপর আসল খেলা ভুলে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দুপক্ষ। মাথা গরম করে খেলার অপরাধে রেফারি সুনীল অধিকারী খিদিরপুরের অরুণ নাথ ও বি এন আরের সজল দাসকে হলুদ কার্ড দেখাতে বাধ্য হন। অবশ্য লাথি মারায় বি এন আরের প্রাধান্য বেশী ছিল। বিশেষ করে বিরতির পর অশোক দাসকে যেন শুধু লাথি মারতেই মাঠে নামানো হয়েছিল। খিদিরপুরের এটি দ্বিতীয় ড্র পয়েন্ট ১০। বি এন আরের ৯টি ম্যাচে ৮ পয়েন্ট ভাঁড়ারে জমা পড়েছে।

ইস্টার্ন রেল বিনা পরিশ্রমে দু'পয়েন্ট ঘরে তুলেছে প্রতিপক্ষ ইস্টার্ন কম্যাণ্ড মাঠে না আসায়। এটি নিয়ে ফৌজি দল মোট ৯টি ম্যাচে ওয়াকওভার দিল। ৮টি ম্যাচের ৪টিতে জিত দুটি ড্র ও বাকিগুলিতে হেরে রেল দলের পয়েন্ট হয়েছে ১০।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—০ ঃ ভ্রাতৃ সংঘ—০

মাঠের বাইরের খেলা অর্থাৎ গড়াপেটা বন্ধ করতে আই এফ এ প্রবর্তিত নতুন নিয়ম



বি এন আর ঃ খিদিরপুর (৮ জুন)/গাঙ্গুলী

আদৌ সফল হবে কিনা সন্দেহ আছে। এই মুহূর্তে যে কটি দলের অবস্থা কাহিল তাদের মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ভ্রাতৃ সংঘ অন্যতম। এদিন কেউ কারো গোলে বল না পাঠিয়ে মূল্যবান একটি করে পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরেছে। খেলার হালচাল দেখে মাঠে উপস্থিত সকলের মনেই একটি প্রশ্ন জেগেছে আগে থেকেই দু'দল নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে মাঠে নেমেছিল কি? ৯টি করে খেলে স্পোর্টিং ও ভ্রাতৃর পয়েন্ট হয়েছে যথাক্রমে ৫ ও ৬। এর মধ্যে স্পোর্টিংয়ের প্রতিটি পয়েন্ট এসেছে ড্র ম্যাচ থেকে।

টালিগঞ্জ অগ্রগামী-১ ঃ রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-০

(প্রদীপ দত্ত)

টানা তিনটি ম্যাচ জেতার পর রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব লাইনচ্যুত হল টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কাছে ১—০ গোলে হেরে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর টালিগঞ্জ গোলটি পায় বিরতির ২১ মিনিটে। শ্যামল দে-র সেণ্টারে মাথা ছুঁইয়ে স্ট্রাইকার প্রদীপ দত্ত দলকে জয়ের পথ দেখায়। সর্বদিক দিয়ে বিচারে টালিগঞ্জের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সারাক্ষণই বজায় ছিল। এ পর্যন্ত ৯টি ম্যাচের ৬টি জিতে একটি ড্র ও দুটিতে হেরে টালিগঞ্জ মাঝারি দলগুলির মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। রেলদল এটি নিয়ে তৃতীয়বার পিছনে গিয়ে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। ম্যাচ খেলেছে ৮টি।

ইস্টার্ন রেল—০ ঃ কুমারটুলি—০

১১ জুন ঃ তুলনায় অনেক সুবিধেজনকভাবে গোলের সুযোগ পেয়েও ইস্টার্ন রেলকে এক পয়েন্ট নিয়ে খুশী থাকতে হয়েছে সুযোগ অপচয়ের মাশুল হিসেবে। অবশ্য কুমারটুলির রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা সবসময় সচেষ্ট ছিল ডিফেন্সের ফাঁক-ফোঁকরগুলি ভরাট করে রাখার কাজে। এদিন একটি দামী পয়েন্ট পাওয়ার সূত্রে কুমারটুলি স্বভাবতই আনন্দিত। তবে ৯টি খেলায় মাত্র ৫ পয়েন্ট পাওয়ায় কুমারটুলির অবস্থা সংকটজনক। বিপরীত দিকে ৮টি ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়ে রেল মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে।

ক্যালকাটা জিমখানা—১ ঃ কাস্টমস—১

(তপন ঘোষ) (অসিত চক্রবর্তী)

কথায় বলে ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এবছর চারটি দল উঠবে ও চারটি দল নামবে এই নতুন বিধান চালু করে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন ময়দানে বোঝাপড়ার খেলা হয়ত বন্ধ করতে পারবেন। কিন্তু বেশ কিছু টিম ইতিমধ্যে নতুন নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চিরাচরিত সমঝোতার খেলায় মেতে উঠেছে। মোহনবাগান মাঠে জিমখানা ও কাস্টমসের খেলায় দুটি গোল হয়েছে ঠিকই তবে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা খেলোয়াড়দের হাবভাবে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল মাঠে উপস্থিত আই এফ এ কর্মকর্তা ও দর্শকদের কাছে। দর্শকদের মন্তব্যের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হতাশভাবে বলে ওঠেন গড়াপেটা শুরু হয়ে গেছে। শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাস্টমসের অসিত চক্রবর্তীর বাঁক খাওয়া সটে জিমখানার গোলকিপার পরাস্ত হয়। এর ১৫ মিনিটের মধ্যে কথা অনুযায়ী (?) জিমখানার তপন ঘোষের ২৫ গজী সট কাস্টমসের গোলে ঢোকে। এরপর খেলোয়াড়রা কান খাড়া করেছিল খেলা শেষের বাঁশী বাজার আশায়। এই সময় জিমখানার ফরোয়ার্ডরা কাস্টমসের অসহায় গোলকিপারকে পেয়েও গোলে সট না নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বল বাইরে মেরে দর্শকদের বিরক্তির চরমে পৌঁছে দেয়। অবশ্য ম্যাচ শুরুর আগে জনৈক কাস্টমস কর্মকর্তা খোলাখুলি ফোরকাস্ট করেছিলেন খেলার ফল ১—১ হবে।

সালকিয়া ফ্রেণ্ডস এদিন ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পাওয়ার সুবাদে দুটি পয়েন্ট পেয়েছে কোন পরিশ্রম না করে। সালকিয়া ৯টি ম্যাচের ৪টি জিত, ৪টি ড্র এবং একটিতে হেরে ১২ পয়েন্ট পেয়ে প্রমাণ করেছে তুলনামূলক বিচারে অনেক বড় দরের টীমের চেয়ে ওরা শক্তিশালী।

অনেকেই আমাদের প্রতিনিধি নন

কিছুদিন ধরে আমাদের দপ্তরে নানারকম অভিযোগ এসে পৌঁছচ্ছে—'খেলার আসরের' প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার এই পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে হাজির হচ্ছেন সংবাদ সংগ্রহের আশায়, ছবি তোলার জন্যও। 'খেলার আসরের' সঙ্গে অনেক লেখক ও সাংবাদিক নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই তারা পরিচিত হলেও তাদের আমরা পরিচয় পত্র দিয়েছি কাজের সুবিধের জন্য। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে অন্য কথা। কিন্তু অপরিচিত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের কাছে আমাদের পরিচয় পত্র দেখতে চাইবেন।

—সম্পাদক

কালিঘাট—১ : জর্জ টেলিগ্রাফ—০

(সুভাষ মোদক)

১২ জুন : গত বছর লিগ কোঠায় আশে-পাশে অনেককে টপকে চতুর্থস্থান দখল করা জর্জ টেলিগ্রাফ এখন পর্যন্ত নিজেদের 'লড়াকু দল' এবার এটা প্রমাণ করতে পারেনি। অথচ দলগত শক্তির নিরিখে জর্জ যথেষ্ট শক্তিধর এবং মরশুমের প্রথম চ্যারিটি ম্যাচটিও জর্জেরই খেলার কথা মোহনবাগানের সঙ্গে। কিন্তু জর্জ টেলিগ্রাফের খেলা দেখে দর্শকরা রীতিমত অবাক ও হতাশ হয়েছেন। আগের ম্যাচ উয়াড়ির কাছে হাতছাড়া করার পর জর্জ টেলিগ্রাফ এদিন তৃতীয়বার বিফল হয়েছে একঝাঁক নতুন টগবগে তরুণ নিয়ে গড়া কালিঘাটের কাছে। কালিঘাট এদিন যোগ্য দল হিসেবেই জয় কুড়িয়েছে। সুমন্ত দাস, সুভাষ মোদক, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও স্বপন মিত্রকে নিয়ে কালিঘাটের অফেন্স লাইনের গতির সঙ্গে জর্জ রক্ষণ কোন সময়েই পাল্লা দিতে পারেনি। একমাত্র রমেন ভট্টাচার্য একা কিছুটা লড়ার চেষ্টা করেছে, সুমন্ত ও বিদ্যুৎ এদিন জর্জ ডিফেন্স নিয়ে ছেলে খেলা করেছে। পাশা-পাশি অভিজ্ঞ ও উঠতি ফুটবলারদের দেখে মনে হচ্ছিল কিছু নবিশকে জর্জের জার্সি গায়ে মাঠে নামানো হয়েছে। জর্জ টেলিগ্রাফ শুরু করেছিল বেশ তেড়েফুঁড়ে। প্রথম মিনিট বারোর মধ্যে বাদল একাই গোটা কয়েক গোলের সুযোগ নষ্ট করে। বিরতির এক মিনিট আগে বাদল একবার লক্ষ্য ভেদ করেছিল জটলার মধ্যে থেকে, কিন্তু রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি অফসাইডের নির্দেশ দিলে জর্জের একটি পয়েন্ট পাওয়ার আশাও মাটি হয়ে যায়। জর্জের আক্রমণ সামলে উঠে কালিঘাট বিপক্ষ সীমানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুরন্ত গতির সাহায্যে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের নাজেহাল করে। ১৫ মিনিটে সুমন্ত দাস একটি বল ডান পায়ে ফ্লিক করে ফাঁকায় দাঁড়ানো সুভাষকে দেয়। এবং দ্রুতগতিতে গোলমুখে পৌঁছে আগুয়ান জর্জ গোলকিপার বিশ্বজিতকে পাস কাটিয়ে সুভাষ জোরালো সটে এগিয়ে দেয় কালিঘাটকে। বিরতির প্রথম মিনিটেই বয়সের ভারে মন্থর জর্জ স্টপার বিভু চক্রবর্তীর ভুলে কালিঘাটের স্বপন বল ছিনিয়ে নিয়ে যে সট করে বিশ্বজিত তৎপরতার সঙ্গে ফিস্ট করে তা প্রতিহত করে। এই পর্বের ২৭ মিনিটে জর্জের রাইট লিঙ্কম্যান সুব্রত অধিকারীর ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া লম্বা সট কালিঘাট গোলকিপার প্রশান্ত ডান দিকে ডাইভ দিয়ে বাঁচায়। ৯টি ম্যাচে ৫টি জিত দুটি ড্র ও একটিতে হেরে ১২ পয়েন্ট। চতুর্থস্থান দখলের জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে



এরিয়ান : খিদিরপুর। এরিয়ানের শঙ্কর অধিকারীর (বাঁদিক) আক্রমণ প্রতিরোধ করছে খিদিরপুরের অরুণ নাথ ও শ্যাম কর্মকার. /শংকর

কালিঘাট। অন্যদিকে সমান ম্যাচে জর্জের সংগ্রহ মাত্র ৮।

উয়াড়ি—১ : স্পোর্টিং ইউনিয়ন—০

(উত্তম চক্রবর্তী)

গত ম্যাচে শক্তিশালী জর্জ টেলিগ্রাফকে বেহাল করার পর উয়াড়ি তাদের দশম খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নকে প্রথম হাফের ২২ মিনিটে রাইট স্ট্রাইকার উত্তম চক্রবর্তীর গোলে হারিয়ে তৃতীয় জয় পেয়েছে। স্পোর্টিং এবছর একটু বেশী শক্তির দল হলেই বেসামাল হচ্ছে। খেলার গতি অনুযায়ী উয়াড়ির আরও বড়সড় ব্যবধানে জয় পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি বিপক্ষ গোল মুখে পৌঁছেও ফরোয়ার্ডরা জায়গামত বল পাঠাতে না পারায়। উয়াড়ি এ পর্যন্ত ১০টি ম্যাচ খেলে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। সমান সংখ্যক ম্যাচে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৫টি পয়েন্ট পেয়ে দারুণ সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন। প্রথম ডিভিসনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা মুস্কিল যদি আগামী ম্যাচে জয় না পায় স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা।

এরিয়ান—১ খিদিরপুর—০

(বিশ্বজিত ভট্টাচার্য)

১৩ জুন : বিপক্ষ গোলমুখে পৌঁছে তৎপরতার সঙ্গে গোলে সট করতে না পারার মাশুল হিসেবে খিদিরপুরকে তৃতীয়বার কোনো পয়েন্ট না নিয়ে টেন্টে ফিরতে হয়েছে লিগ কোঠার চতুর্থ স্থান দখলের অন্যতম দাবীদার ঐতিহ্যশালী এরিয়ানের কাছে ০—১ পিছিয়ে পড়ে।

খেলা শুরুর বাঁশী পড়তেই এরিয়ানের ফরোয়ার্ডরা দ্রুতলয়ে বিপক্ষ সীমানায় উঠে এসে প্রথম মিনিটেই গোল পায় খিদিরপুর রক্ষণকে অপ্রস্তুত করে। ডান প্রান্ত থেকে কাশী পালের লব করা বলে অরক্ষিত বিশ্বজিত হেড করলে বল সেকেণ্ডবারের গা ঘেঁষে গোলে ঢোকে। গোল খেয়ে ফুঁসে ওঠা খিদিরপুর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে এরিয়ান রক্ষণকে ব্যস্ত করে তোলে। মিনিট পনেরর মাথায় খিদিরপুরের স্ট্রাইকার সোমনাথ ব্যানার্জি খুব কাছ থেকে তাড়াহুড়ো বাইরে বল মেরে গোল শোধের একটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে। এরপর দুপক্ষই সমানতালে আক্রমণ শানিয়েছে, কিন্তু আসল কাজটি কেউ হাসিল করতে পারেনি। দু'দলের মধ্যে এরিয়ানের প্রাধান্য কিছুটা বেশী ছিল। কিন্তু ডিপডিফেন্সে সমীর বা সমীরণ কোন সময়েই ভাল খেলতে পারেনি। যার ফলে মাঝে মাঝেই গোলমুখে বিপদ সৃষ্টি করেছে বিপক্ষ খেলোয়াড়রা। অবশ্য নিয়মিত গোলকিপার অসুস্থ লক্ষণের অনুপস্থিতিতে গোলরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমে জগদীশের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। বিজিত দলের ফরোয়ার্ডরা জগদীশকে বিব্রত করার মত সট করতে পারেনি সারা খেলায়। তবে আক্রমণের প্রধান অস্ত্র অমিত বাগচীকে বাদ রেখে মাঠে

নেমে খিদিরপুরের ফায়ারিং স্কোয়াড পুরো শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে পারেনি। বিরতির পর দু'দলই বেশ কয়েকটি ভাল মুভমেন্ট করেছিল। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। ১০টি ম্যাচে ৭টি জিতে একটি ড্র ও বাকি-গুলিতে হেরে ১৫ পয়েন্ট পাওয়ার সূত্রে এরিয়ানের তিন প্রধানের পরের স্থানটি পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। পাশাপাশি টালিগঞ্জ ও কালিঘাট ভাগ বসাবার ফাঁক খুঁজছে। পক্ষান্তরে খিদিরপুরের সংগ্রহ ৯টি ম্যাচে দশ।

বি এন আর—১ : পোর্ট ট্রাস্ট—০
(মানিক ভৌমিক)

এদিন পয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত দাঁত চেপে বিপক্ষ আক্রমণের মোকাবিলা করেও পোর্ট ট্রাস্ট শেষরক্ষা করতে পারেনি। এই সময় পোর্ট রক্ষণের মধ্যমণি সলিল দাসের ভুলে বি এন আরের মানিক ভৌমিক প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয়। প্রথমার্ধে ঘনঘন আক্রমণ চালিয়েও বি এন আর বিপক্ষ গোলমুখে গিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে হয় বাইরে বল মেরেছে বা সোজা গোলরক্ষকের হাতে বল তুলে দিয়েছে। পোর্টের সকলেই প্রায় ঘর সামাল দিতে ব্যস্ত থাকায় খুব স্বাভাবিক কারণেই বি এন আর প্রাধান্য নিয়ে খেলেছে। রক্ষণভাগকে জোরদার করে পোর্ট কিছুটা সফল হয়েছিল। কিন্তু বিরতির দশ মিনিটে অমিত দাশগুপ্তের কর্নার কিক ক্লিয়ার করতে গিয়ে পোর্ট স্টপার সলিল দাস মিস হেড করলে বল বারে লেগে সামনে ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকা মানিকের কাছে যেতেই মানিক দ্রুত বল জালে পাঠায়। দশম খেলায় বি এন আর-এর এটি চতুর্থ জয়। সমান ম্যাচে পোর্ট এটি নিয়ে মোট পাঁচবার হারল।

রাজস্থান—২ ভ্রাতৃ সংঘ—০
(কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী,
প্রীতি ঘোষাল)

রবীন্দ্র সরোবরে ভ্রাতৃ সংঘকে ২—০ গোলে হারিয়ে রাজস্থান যোগ্য দল হিসেবেই মরশুমের ষষ্ঠ জয় কুড়িয়েছে। রাজস্থান দুই অর্ধে একটি করে গোল করে। গোড়ায় পাঁচ মিনিটেই একটি সুন্দর আক্রমণের ফসল হিসেবে রাজস্থানের কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী দলকে এগিয়ে দেয়। গোল খেয়ে ভ্রাতৃ সংঘ গা-ঝাড়া দিয়ে গোল শোধের চেষ্টা করেছিল। যার বেশীর ভাগই ছিল এলোমেলো। যার ফলে রাজস্থান ডিফেণ্ডারদের গোটা ম্যাচে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে খেলতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। বিজয়ী দল দ্বিতীয় গোলটি পায় বিরতির ১৮ মিনিটে ছোট খাটো চেহারার দ্রুতগতি লেফট উইং প্রীতি ঘোষাল মারফৎ। ১০টি ম্যাচের চারটিতে হেরে বাকিগুলিতে জিতে রাজস্থানের অবস্থা মোটামুটি ভাল। অন্যদিকে গত খেলায় স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ড্র করার পর এদিন হেরে ভ্রাতৃ আরও এক ধাপ পিছিয়ে পড়ল। ভ্রাতৃর হয়েছে ৬ পয়েন্ট। ম্যাচ দশ।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগ তালিকা

৯ জুলাই : মহমেডান এরিয়ান (মহমেডান)।

১০ জুলাই : পুলিশ : কুমারটুলি (ইস্টবেঙ্গল), উয়াড়ি : খিদিরপুর (মোহনবাগান)।

১১ জুলাই : হাওড়া ইউনিয়ন : ভ্রাতৃ সংঘ (মোহনবাগান), ইস্টার্ন কম্যাণ্ড : টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মহমেডান), কাস্টমস : বি এন আর (ইস্টবেঙ্গল)।

১২ জুলাই : জর্জ টেলিগ্রাফ : পোর্ট ট্রাস্ট (মোহনবাগান), কালিঘাট ইস্টার্ন রেল (ইস্টবেঙ্গল)।

১৩ জুলাই : মোহনবাগান : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস (মোহনবাগান), খিদিরপুর : রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব (রবীন্দ্র সরোবর), রাজস্থান : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (ইস্টবেঙ্গল), উয়াড়ি : ক্যালকাটা জিমখানা (মহমেডান)।

১৪ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল : কাস্টমস (ইস্টবেঙ্গল), টালিগঞ্জ অগ্রগামী : কুমারটুলি (মোহনবাগান), হাওড়া ইউনিয়ন : পুলিশ (মহমেডান)।

১৬ জুলাই : মোহনবাগান : ক্যালকাটা জিমখানা (মোহনবাগান), জর্জ টেলিগ্রাফ : খিদিরপুর (ইস্টবেঙ্গল), রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব : বি এন আর (মহমেডান)।

টলিগঞ্জ অগ্রগামী-১ : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস-১
(প্রদীপ দত্ত) (শিবব্রতনাথ)

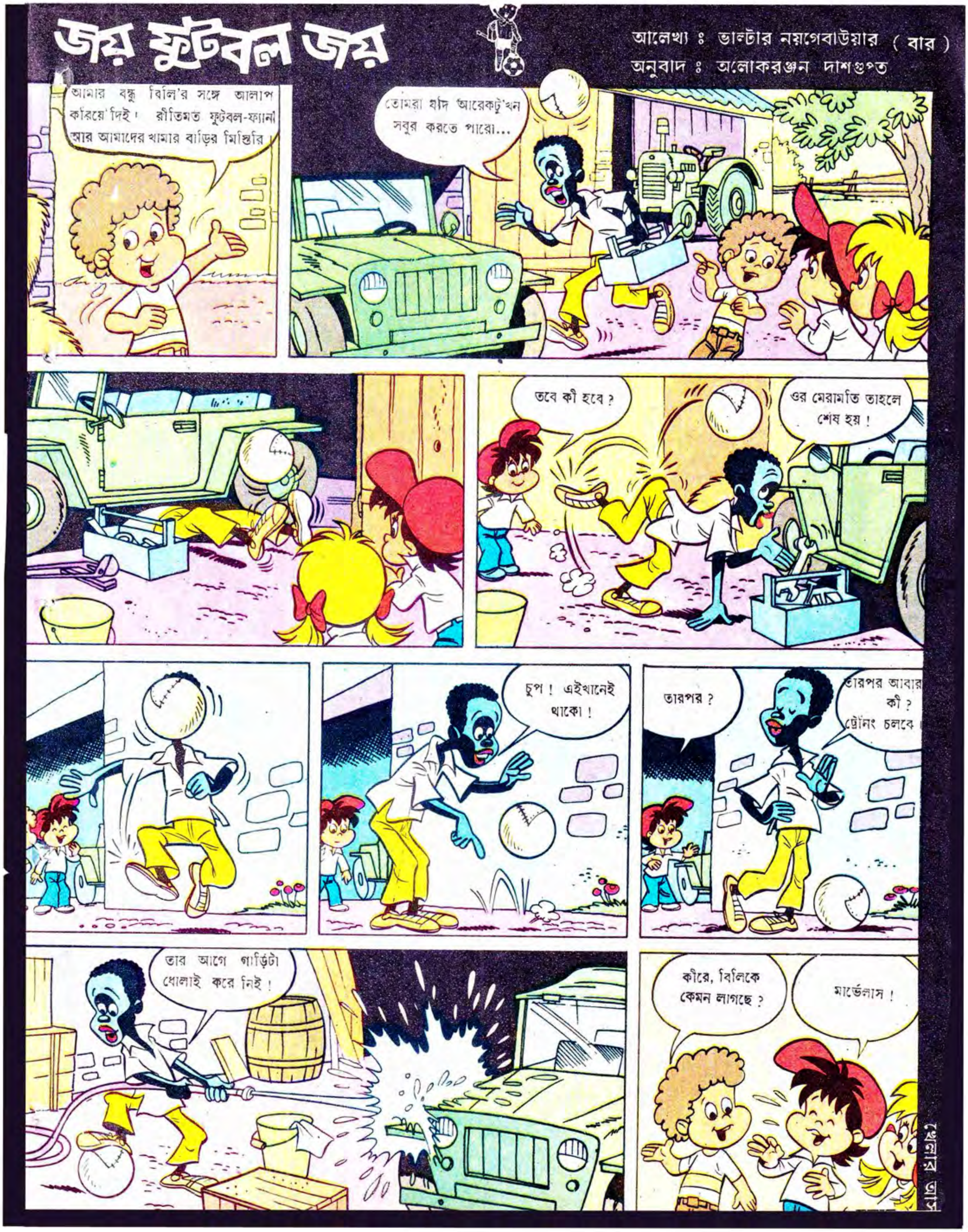
১৪ জুন : বেশকিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া টালিগঞ্জ এদিন দ্বিতীয়বার একটি পয়েন্ট ভাগ দিতে বাধ্য হয়েছে অপেক্ষাকৃত কমজোরী দল সালকিয়ার সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা শেষ করে। এদিন টালিগঞ্জ কোন সময়েই ভাল খেলেনি। প্রথমার্ধে কোন পক্ষই গোল পায়নি। বিরতির পর খেলায় ফিরে পাওয়া টালিগঞ্জ বিপক্ষ সীমানায় প্রাধান্য বিছিয়ে খেলে। ২ মিনিটের মাথায় স্ট্রাইকার প্রদীপ দত্তের গোলে এগিয়ে যায়। এরপর গোল খেয়ে ফুঁসে ওঠা সালকিয়ার ঘনঘন আক্রমণের চাপ টালিগঞ্জের জারিজুরি দাবিয়ে দেয়। গোল শোধের জন্য সালকিয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সফল হয় খেলা শেষ হওয়ার দু মিনিট আগে। এই সময় একটি সুন্দর আক্রমণের ফসল হিসেবে টালিগঞ্জ আঁটোসাঁটো রক্ষণে ফাটল সৃষ্টি করে শিবব্রত খেলার সমতা ফিরিয়ে আনে। উল্লেখ্য গতবছরেও এই খেলার ফল ছিল গোলশূন্য। দশটি ম্যাচে ৭টি গোল করেও ২টি গোল হজম করে টালিগঞ্জের পয়েন্ট ১৪। লিগ কোঠায় চতুর্থ স্থান দখলের লড়াইয়ে এরিয়ানের সঙ্গে জোরদার লড়াই চালাতে বদ্ধপরিকর টালিগঞ্জ এই ম্যাচে ড্র করে এরিয়ানের চেয়ে এক পয়েন্ট পিছিয়ে পড়ল। অন্যদিকে সমান খেলায় সালকিয়া পেয়েছে ১৩ পয়েন্ট। জিতেছে চারটিতে (ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়াক ওভারসহ) ড্র হয়েছে পাঁচটি। হেরেছে মাত্র একটি খেলায়।

—খেলা শেষ করে—



অন্যান্য ম্যাচগুলির মত এ দিনও যথারীতি এরিয়ান মাঠে ইস্টার্ন কম্যাণ্ড দল অনুপস্থিত থাকায় ১০টি ম্যাচের পাঁচটিতে হেরে যাওয়া কুমারটুলি অতি প্রয়োজনীয় দুটি পয়েন্ট পেয়ে নিজেদের পয়েন্ট সংকট আংশিক মিটিয়েছে।

মুদ্রক ও প্রকাশক : অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত


জয় ফুটবল জয়
আলেখ্য ঃ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার (বার)
অনুবাদ ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
আমার বন্ধু বিলি'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। রীতিমত ফুটবল-ফ্যান! আর আমাদের খামার বাড়ির মিস্ত্রির!
তোমরা যদি আরেকটু'খন সবুর করতে পারো...
তবে কী হবে?
ওর মেরামতি তাহলে শেষ হয়!
চুপ! এইখানেই থাকো!
তারপর?
তারপর আবার কী? ট্রেনিং চলবে!
তার আগে গাড়িটা ধোলাই করে নিই!
কীরে, বিলিকে কেমন লাগছে?
মার্ভেলাস!

Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 22nd June 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



দেবরাজ / তপন রায়